Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এপ্রিল ২০২১ □ চৈত্র ১৪২৭-বৈশাখ ১৪২৮

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

পয়লা বৈশাখে গ্রামের উৎসব-বান্নি

চৈত্রসংক্রান্তির আয়োজন

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তাসনুভা তাহমিদ, সপ্তম শ্রেণি, বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

নাফিসা তাবাসসুম, দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
এপ্রিল ২০২১ ■ চৈত্র ১৪২৭-বৈশাখ ১৪২৮

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, এসে গেছে বাংলা নববর্ষ ১৪২৮। ক্যালেন্ডারের পাতায় যোগ হলো নতুন আরেকটি বছর। পুরাতন বছরের সবকিছু ধুয়ে মুছে শুরু হবে আমাদের নতুন করে পথচলা। তোমাদের জানাই নতুন বছর ১৪২৮ এর শুভেচ্ছা। একইভাবে আমরা বিদায় জানিয়েছি পুরনো বছর ১৪২৭ কে। আমরা বাঙালি। আমাদের আছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। বাংলা নববর্ষ বাঙালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলা সনের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ এর সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালির সংস্কৃতি-আনন্দ-উৎসব।

বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। পহেলা বৈশাখের এই দিনে দেশের আপামর জনসাধারণ নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশা নিয়ে বাংলা নববর্ষকে বরণ করে। নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গ্রামগঞ্জে, শহর-বন্দরে সকল জনসাধারণ রং-বেরঙের নতুন পোশাক পরিধান করে, ঐতিহ্যবাহী খাবার খায়, মেলায় যায়, নৌকা বাইচের আয়োজন করে, জারি সারি গান গায় আর বিভিন্ন ধরনের নির্মল আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠে।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো জানো আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মারাত্মক হারে বাড়ছে। সেইসাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রাণহানির সংখ্যা। তবুও তোমরা মন খারাপ করবে না। যেটুকু আনন্দ করা যায় ঘরে বসেই করবে। সর্বোপরি করোনা ভাইরাসের এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে কঠোরভাবে। তবেই আমরা ধীরে ধীরে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত হবো ইনশাআল্লাহ।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৭ই এপ্রিল সেই সরকারের মাননীয় সদস্যগণ শপথ নেন। আমরা আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি ইতিহাসের সেই বীর সেনাদের।

ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য শুভ কামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

০৬ পয়লা বৈশাখে গ্রামের উৎসব-বাল্লি/মোহাম্মদ আজহারুল হক
০৮ চৈত্রসংক্রান্তির আয়োজন/ বিনয় দত্ত
১৫ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিবনগর সরকার/খান চমন-ই-এলাহি
১৭ স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি/গোপেশচন্দ্র সূত্রধর
২১ ফিরে এল মসলিন/আরিফ রহমান
৩১ যাঁর নেতৃত্বে চারুকলা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৩৩ আগরতলা বইমেলায় ডিএফপি/নুসরাত জাহান
৩৫ মাসিক খেলাঘরের পথ চলা/খালেক বিন জয়েনউদদীন
৪০ রহস্যময় শব্দ/শামীমা নাসরিন
৪৩ বারবি ডলের অজানা কথা/এম আতিকুল ইসলাম
৪৯ করোনা প্রতিরোধে ফল/মো. জামালউদ্দিন
৫০ মাটির নীচে ভবন/শাহানা আফরোজ
৫৫ বাংলাদেশি কন্যার বিরল সম্মননা/জান্নাতে রোজী
৫৬ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস/আনজাম রশীদ খান
৫৭ বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস ও আমাদের নিদর্শন/মেজবাউল হক

স্মৃতিকথা

৩৭ আটঘরিয়ার কিশোর মুক্তিযোদ্ধা/আমিরুল ইসলাম রাঙা

গল্প

১০ বৈশাখি মেলায় একদিন/সালাম ফারুক
২৯ পেটমোটা শেয়ালের গল্প/মুহাম্মদ বরকত আলী
৩৬ বোকা কাকের কাণ্ড/তারিকুল ইসলাম সুমন

করোনার গল্প

৪৫ নোটনের মন/মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

সাফল্য প্রতিবেদন

৫২ বাংলার বঙ্গ/অর্ণা তাবাসসুম
৫৪ মানহার 'ক্যাঙারু মাদার কেয়ার'/সুমাইয়া মৌশাখি
৬০ চির ভাস্বর বঙ্গবন্ধু/সাদিয়া ইফফাত আখি

বড়োদের কবিতা

১৩ বোশেখ এল/আমিরুল হক
১৩ বৈশাখ/মো. মাইদুল ইসলাস
১৩ পহেলা বৈশাখ/মঈনুল হক চৌধুরী
১৪ নববর্ষের আহ্বান/গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন
২০ বঙ্গবন্ধু/তাহসিন আহমেদ
২৭ একটি ছবি/বোরহান মাসুদ
২৭ বাংলার অধিপতি/শেলী সেলিনা
২৮ ভূতের রসগোল্লা/নাহার আহমেদ
২৮ ঘড়ি/শফিকুল আলম সবুজ
২৮ মশা/আমানুল্লাহ আমান

ছোটোদের ছড়া

১৪ শুভ নববর্ষ/মাসুদুর রহমান
২৮ নতুন রূপে আকাশ/লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

ছোটোদের গল্প

৪৪ আজব গাছ/নবনিল আহমেদ

ছোটোদের আঁকা

প্রচ্ছদ: তৃয়াশা সরকার
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: তাসনুভা তাহমিদ, নাফিসা তাবাসসুম
শেষ প্রচ্ছদ: শ্রাবন্তী ঘোষ অর্থে

১০ ত্রিবিদ সরকার
৩৪ রফিকুল ইসলাম
৩৯ ইরিনা হক
৪৮ আয়ান হক ভূঞা
৬২ ফারাহনাজ সিদ্দিকী রিমিন
৬২ শারিকা তাসনিম নিধি
৬৩ তাসদীদ তাবাসুম আসফিয়া
৬৩ ইরাম ইনায়া
৬৪ মীর্জা মাহের আসেফ
৬৪ সানজিদা আক্তার রুপা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নতুন দিনের প্রত্যাশায়

আমরা একটি নতুন বছরে পা রাখলাম। স্বাগত ১৪২৮ বঙ্গাব্দ । বিদায়ী বছরের অপূর্ণতা দূর করার আশা ও প্রত্যয় নিয়ে আসে নতুন বছর। এ রকম আশাময় মুহূর্তে সকলকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নববর্ষ বাঙালির জীবনে নতুন বছরের প্রথম দিন, নতুন বারতা। সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় বাংলা সনের। নববর্ষ বাঙালির সহস্র বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, প্রথা, আচার, অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক। বাঙালিরা এ দিনে পুরোনো বছরের ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, ক্লেশ-গ্লানি ভুলে নতুন বছরকে মহানন্দে বরণ করে নেয় সমৃদ্ধি ও সুখময় জীবন প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। মূলত কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়কে ঘিরে এর প্রচলন। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিসাব মেটানো। দিনে-দিনে পয়লা বৈশাখ হয়ে উঠেছে এক সার্বজনীন সাংস্কৃতিক আনন্দ-উৎসব।

প্রতি বছরের মতো এবারো নববর্ষের সূর্য উঠেছে। তবে আজকের এই বৈশাখ বাঙালির জীবনের যে-কোনো বৈশাখের চেয়ে আলাদা। করোনা মহামারির কারণে বৈশ্বিক এই দুর্যোগের সময় আমাদের জীবন অবরুদ্ধ। ঘরে বসেই দেশের মানুষ মোকাবিলা করছে এই মহামারির। কিন্তু লাল-সাদা শাড়ি বা জামা পরে ঘর থেকে বাইরে বেড়ানোর তাড়া নেই কারোর। রাজধানীর রাজপথগুলো জনবিরল। রমনার বটমূলে হয়নি ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী প্রভাতি গানের অনুষ্ঠান। বিশ্ব ঐতিহ্যের খ্যাতি পাওয়া বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রাও বের হয়নি চারুকলার সামনে থেকে। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বসেনি কারুপণ্যের মেলা। তবু এসেছে পয়লা বৈশাখ। বাংলা দিনপঞ্জিকায় বুধবার (১৪ই এপ্রিল) শুরু হয়েছে নতুন বছর ১৪২৮ সনের দিন গণনা। পথে নেমে নববর্ষের উৎসবে মেতে উঠতে না পারলেও ঘরে থেকে পরিবারের প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে দিনটি উদযাপন করেছে বাঙালি জাতি।

পয়লা বৈশাখের বাংলা ঢোলের বাজনা বেজেছে বাঙালির মনে মনে। প্রাণে প্রাণ মিলেছে রাস্তা বা খোলা ময়দানে নয়, যার যার বাসায় কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, ম্যাসেঞ্জারে। উৎসব হয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে, নিজের মতো করে। পান্তা-ইলিশ খাওয়া, মুড়ি-মুড়কি, মণ্ডা-মিঠাই সবই হয়েছে, তবে তা যার যার ঘরে। এবার সর্বত্রই প্রায় অভিন্ন পরিস্থিতি থাকায় সব উৎসবই উদযাপিত হয়েছে সীমিত পরিসরে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এবারের পহেলা বৈশাখের রংটাই পালটে দিয়েছে। করোনা সংক্রমণের কারণে বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ আয়োজন-উদযাপনে কোনোভাবেই জনসমাগম করা যাবে না বলে জানিয়েছিল সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সকল অনুষ্ঠান পরিহার করে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম বা অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। সকালে চারুকলা অনুষদের শিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন মুখোশ নিয়ে অনুষদ প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্ষিপ্তভাবে প্রতীকী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

এর মধ্যেও আমরা নতুন বছরকে বরণ করে নিয়েছি। সব রোগ-শোক-জরা-গ্লানি ঝেড়ে ফেলে নতুন বছর দেশবাসীর জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে আনবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শুভ হোক ১৪২৮।

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হতো। খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।

সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরি সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

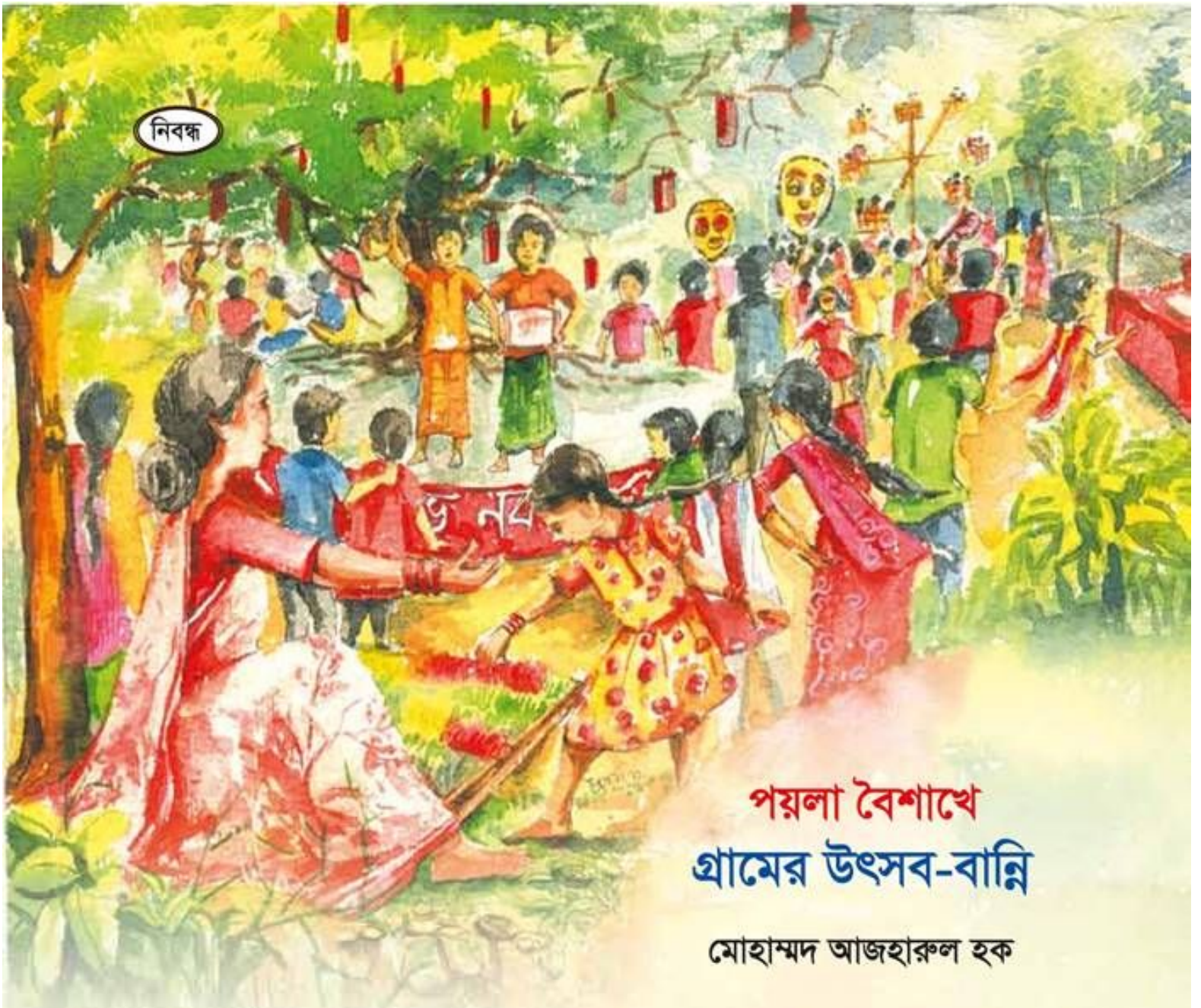

নিবন্ধ

পয়লা বৈশাখে গ্রামের উৎসব-বান্নি

মোহাম্মদ আজহারুল হক

বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখ গ্রামবাংলার জীবনে নতুন প্রাণের ধারা নিয়ে আসে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মনে বৈশাখ আশার প্রেরণা হয়ে আসে। বৈশাখকে নানাভাবে পালন করে গ্রামের মানুষ। গ্রামে খাজনা আদায়ের জন্য নায়েব নামে পরিচিত পুরাতন তহশিলদাররা (বর্তমানে উপ সহকারি ভূমি কর্মকর্তা) তহশিল অফিসে (বর্তমানে ইউনিয়ন ভূমি অফিস) হালখাতা খুলত বেশ কয়েক বছর আগেও। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা নতুন হালখাতা খুলত এবং খরিদ্দারদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করত । আজকাল ঘরে কিছু নিয়মকানুন মানা হয় পয়লা বৈশাখের দিন। খাবারে সাজনা, তিতা করল্লা, নানান পদের শাক, ভর্তা, ভাজি, আম ডাল এগুলো চাই। শহরে বৈশাখ কিছুটা আধুনিকতার ছাপ আছে। মঙ্গল শোভাযাত্রা, রমনার বটমূলে বর্ষবরণ, পান্তা খাওয়া, বৈশাখি পোশাক পড়া, বৈশাখি সাজগোজ শহুরে বৈশাখির মজা। শহরে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা হালখাতা করে থাকে এবং তাদের গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বিতরণ করে থাকে। হালখাতার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা পুরাতন দেনাপাওনা চুকিয়ে নতুন হিসাব খুলে থাকে।

গ্রামে বৈশাখের প্রধান উৎসব ছিল বান্নি। বান্নি মানে মেলা। তবে মেলা বুঝতাম না, বান্নি বুঝতাম। মেঘের দেবতা বরুণ-বারুণির স্নানের মেলাই বান্নি বলে পরিচিত। চৈত্রের শেষে বৈশাখের প্রথম দিন

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বান্নি হয়। প্রায় ৫০ বছর আগের কথা। ছোটো বেলা বান্নির জন্য আমরা কয়েক মাস আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতাম। এটা সেটা হাটে বিক্রি করে টাকা জমানোর একটা চেষ্টা থাকত।

আমাদের সময় ছেলেদের বান্নির প্রধান আকর্ষণ ছিল কাটারি (সহানীয় নাম কাডারি) কেনা। কাটারি হলো ছোটো দা, সাইজে চাকুর মতো। এটা দিয়ে কাঁচা আম পাতলা করে কেটে লবণ দিয়ে খাওয়ার জন্য। ঐ সময় গাছে গাছে কাঁচা আম ঝুলে থাকে। গাছ থেকে পেড়ে কাঁচা আম বন্ধুদের নিয়ে লবণ দিয়ে কেটে খাওয়ার মজাই ছিল দারুণ। বারুদের পিস্তল, গুলাইল কিনতেই হতো।

বান্নিতে খাওয়ার অনেক জিনিস থাকে। আমাদের প্রিয় ছিল গুড়ের জিলাপি। এটা পাতায় দিত আমরা কিনে খেতে খেতে বাড়ি চলে আসতাম। আমাদের ঘুড়ি কেনার শখ হতো। এটা নাটাই সুতার সাধারণ ঘুড়ি নয়। বিশাল বড়ো প্রজাপতি বা অন্য কোনো আকারের ডাক ঘুড়ি (ডাক ঘুড্ডি) সম্ভবত উড়লে বেশ শব্দ হতো বলে এর নাম এমন ছিল। এটা সুতায় উড়ত না, গুন বা মোটা সুতলি লাগত। এটা হাতে ধরে রাখা যেত না কোমরে বাঁধলে টেনে নিয়ে যেত। তাই তালগাছে বেঁধে এটাকে উড়াতে হতো।

বান্নিতে পাওয়া যেত মুরালি, গজা, নিমকি, বাতাসা, চিনির সাজ (পুতুল, পশুপাখি প্রভৃতি) খই, মুড়ি মুড়কি, কদমা, আমিত্তি, রসগোল্লা, দই মিষ্টি, হাওয়াই মিটাই ইত্যাদি। স্নো, পাউডার, আলতা, বাসের সাবান, চিরুনি, লাল ফিতা, চুড়িও পাওয়া যেত। বাঁশি, ডুগডুগি, মাছ মারার ছিপ, বরশি, সিসা, ফতানা, লাল পিঁপড়ার ডিম (মাছ মারার জন্য) কিনতে পাওয়া যেত। ডুলা, মাছ ধরার চাই, কুনিজাল, জালি, মাতলা, হাতপাখা, খড়ম, ডালা, কুলা দাও, কাঁচি, নিড়ানি লাঙলের ফাল, ডাবা, কল্পি, মাটির হাড়ি-পাতিল, সরা, বাসন, কুপি, গাছা সবই পাওয়া যেত। অনেকে ধান রাখার জন্য বড়ো মটকাও কিনে আনত। ঘর-গৃহস্থালির আসবাপত্র সবই পাওয়া যেত।

কাগজের ফুল, মাটির পুতুল, টিয়া, ময়না, হাতি, ঘোড়াসহ হরেক রকম পশুপাখি, টাকার ব্যাংক পাওয়া যেত মেলায়। বাঁশের বাশি, হারমোনিয়াম বাঁশি, গামছা, লুঙ্গি, গেঞ্জি, রুই, তুলা সবই কিনতে পাওয়া যেত বান্নিতে।

পুতুল নাচ, বোবা বাইস্কোপ, নাগরদোলা হতো বান্নিতে। বোবা বাইস্কোপ দেখাটা একটা মজার আইটেম ছিল বান্নিতে। তবে বান্নিতে চা পাওয়া যেত না ছিল না কফি। কোনো পলিথিন ছিল না। জিনিসপত্র দিত কাগজের ঠোঙায় এবং কিছু কিছু খাবার দিত পাতায়। বান্নি থেকে আসার কদিন পর্যন্ত এর রেশ থাকত। কে কী কিনল এটা নিয়ে চলত কথাবার্তা। আগামী বছরের জন্য সবাই অপেক্ষা করতাম কবে আবার বৈশাখ আসবে, আসবে প্রাণের বান্নি। ■

লেখক: কবি ও কথা সাহিত্যিক

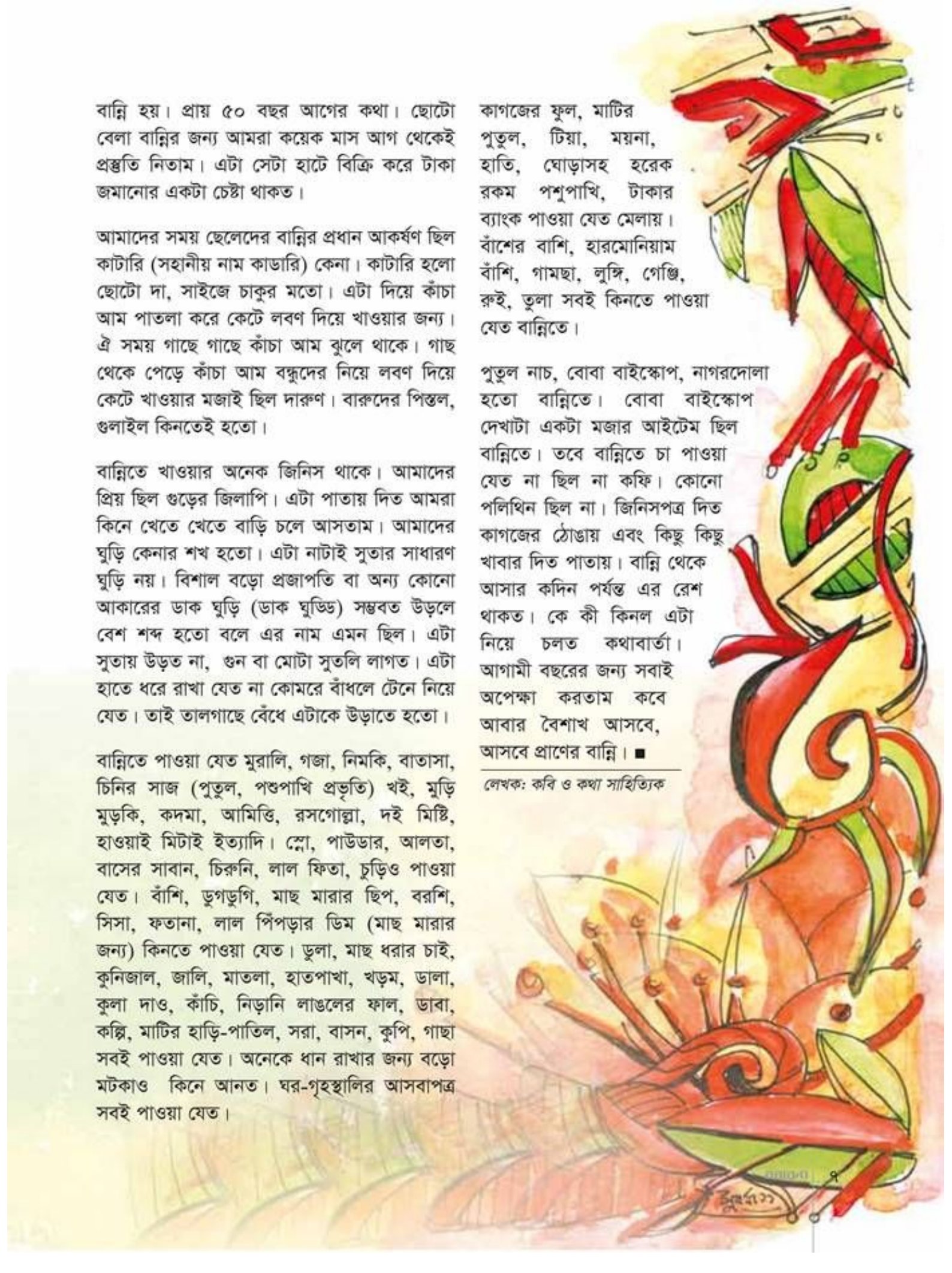

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

চৈত্রসংক্রান্তির আয়োজন

বিনয় দত্ত

বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাঙালির আয়োজনের ডালাটা বেশ সমৃদ্ধ। ভিন্ন আয়োজনে বর্ণিল হয়ে উঠে বাংলার প্রতিটি মাস। আর এই সকল আয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার কৃষিপ্রধান জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক চাহিদা। বাংলা মাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনে আয়োজন করা হয় চৈত্রসংক্রান্তির।

আদিকালে এই উৎসবটি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বিশেষভাবে পালন করলেও এখন তা সার্বজনীনতায় রূপ নিয়েছে। ঘরোয়া আয়োজন থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সবক্ষেত্রেই চৈত্রসংক্রান্তির আয়োজন থাকে চোখে পড়ার মতো।

'সংক্রান্তি' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সূর্য ও গ্রহাদির এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন, সঞ্চার বা ব্যাপ্তি। মূলত চৈত্র থেকে বর্ষার আগ পর্যন্ত যখন সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থাকে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও বৃষ্টি লাভের আশায় কৃষিপ্রধান জনগোষ্ঠী বহু আগে চৈত্রসংক্রান্তির উদ্ভাবন করেছিলেন।

সূর্যের প্রখরতা না কমলে নতুন ফসলের আশানুরূপ ফল আসবে না বলেই এই প্রথার উদ্ভাবন। তাই এদিন বাঙালিরা (আদি বৈদিকরা বা জনগোষ্ঠীরা) বেশকিছু ধর্মীয় ও লোকাচারমূলক অনুষ্ঠান পালন করত। যেমন-গাজন, নীল পূজা বা চড়ক পূজা, হর-পার্বতীর গাজন বা শিব-গৌরীর নাচ, হরেক রকমের সবজি দিয়ে পাচন রান্না, চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, হালখাতার শেষ প্রস্তুতি ইত্যাদি।

চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব চড়ক। এই উপলক্ষ্যে গ্রামের শিবতলা থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে অন্য শিবতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। একজন ঢাকি ও কাঁসর বাদকের সাথে একজন শিব ও একজন গৌরী সেজে নৃত্য করে এবং অন্য ভক্তরা নন্দি, ভৃঙ্গী, ভূতপ্রেত, দৈত্য-দানব প্রভৃতি সেজে ঢাক এবং কাঁসরের তালে নাচে। নাচের তালে তালে নানারকম লৌকিক ছড়া পাঠ করা হয়। লৌকিক ছড়ার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে শিবের নিদ্রা ভঙ্গ থেকে শুরু করে তার বিয়ে, কৃষিকর্ম ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকে।

চড়কপূজার দু-দিন আগে পূজারিরা পূজা-অর্চনা শুরু করেন। মূল অনুষ্ঠানের দিন অনেক আচার-নিষ্ঠার মাধ্যমে ভক্তরা পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। যারা চড়কে ওঠেন, তারা তিন দিন উপবাস ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করেন। শিবের আশীর্বাদ লাভের আশায় আদিকাল থেকে কষ্টসহিষ্ণু এই অনুষ্ঠানটি গ্রাম বাংলায় উদযাপিত হয়ে আসছে। শিব ভক্তরা শারীরিক কষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান করেন শিবের অপার কৃপা লাভের আশায়। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীরা ভালো ফলনের আশায় এই কষ্টকে সানন্দে গ্রহণ করেন।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পুরোনো ইতিহাস থেকে দেখা যায়, ১৯০৩ সালের সরকারি ছুটির তালিকাতে পহেলা বৈশাখের কোনো ছুটি ছিল না। তখন সরকারি ছুটি ছিল ১৩ই এপ্রিল। তা ছিল 'চৈত্রসংক্রান্তি'র দিন। চৈত্র মাসের শেষ দিন। স্বাধীনতার পরে বৈশাখ উপলক্ষ্যে পহেলা বৈশাখের দিন সরকারি ছুটি চালু হয়েছে।

পুরোনো বছরের বিদায় বেলায় মানুষ সাধারণত অতীতের সব গ্লানি, ব্যর্থতা, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক থেকে মুক্তির আশা করে এবং নতুন বছরে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা আশা করে। সাধারণত চৈত্রের তীব্র তাপ থেকে মুক্তির আশায় চৈত্রসংক্রান্তিতে এত আয়োজনের উদ্ভাবন।

এখনো বিভিন্ন গ্রামে চৈত্র মাসের একদিন আগে থেকে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা বসে। মেলায় বাঁশ, বেত, কাপড়, প্লাস্টিক, মাটি ও ধাতুর তৈরি বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র ও খেলনা থাকে। বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, জিলাপি, লাড্ডুও বিক্রি হয়। মাটির খেলনা থেকে শুরু করে প্লাস্টিকের খেলনার দোকানে শিশু-কিশোরদের ভিড় থাকে দেখার মতো। এছাড়া নাগরদোলা, দোলনা, পালকি চড়ার আয়োজনে তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ বেশি লক্ষ করা যায়। বায়োস্কোপ, সার্কাস, পুতুলনাচ, ঘুড়ি ওড়ানো, যাত্রাপালা ইত্যাদি বিনোদনের জায়গায় সকল বয়সের মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। ঘর গৃহস্থালির বিভিন্ন সরঞ্জামাদি কেনার জন্য গ্রামের নারীরা এই মেলার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। অঞ্চলভেদে চৈত্রসংক্রান্তির এই মেলা তিন থেকে চারদিন চলে। কোনো কোনো অঞ্চলে চৈত্রের শেষ দিনে শুরু হওয়া মেলা বৈশাখের শুরু পর্যন্ত চলে। মূলত গ্রামবাংলার কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর এই আয়োজন এখন সার্বজনীনতায় রূপ নিয়েছে। ■

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বৈশাখি মেলায় একদিন

সালাম ফারুক

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল মেধার। উঠেই পাশে শোয়া বাবাকে ডাকল।

- বাবা, কয়টা বাজে?

কোনো মতে চোখ মেলে মোবাইল ফোনের একটা বাটন চেপে সময় দেখে নিল বাবা।

- ৫টা এখনো বাজেনি মা।

মেয়েকে ঘুমোতে বলে আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গে মেধাও।

কিছুক্ষণ পর আবারও বাবাকে ডেকে তুলল মেধা।

- বাবা, এখন কয়টা বাজে?

- সাড়ে ৬টা। আবারও মোবাইল ফোনের একটি বাটন চেপে সময় দেখে বললেন তিনি।

- উফ, আর ভাল্লাগছে না। উঠে পড়ি।

- এত সকালে উঠে কী করবে?

- আজ না মেলায় যাব। রেডি হতে হবে না?

বাবা বুঝলেন, বৈশাখি মেলায় যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে মেয়ে।

জীবনের প্রথম গ্রামের মেলা দেখতে নববর্ষের আগে ওরা এসেছে কুমিল্লায়, দাদা বাড়ি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ঢাকার একটি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে মেধা। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় পাঠ্যবইয়ে বৈশাখি মেলার কথা পড়েছিল। বর্ণনা পড়তে পড়তে হয়ত সেই ছবি এঁকেছে নিজের মনেও। বইয়ে যেসব বর্ণনা রয়েছে, তার স্বাদ নিতে গ্রামের বিকল্প নেই। আজ তার সেই আশা পূরণ হতে চলেছে। তাই হয়ত ছুটির দিনেও ঘুম পালিয়েছে সকাল হওয়ার আগেই।

-ওঠো, নিধিকেও ডাকো। তোমার আম্মুকেও। তোমরা রেডি হতে হতে আমি আরেকটু ঘুমিয়ে নেই। অনুমতি পেয়ে খুশিতে নেচে ওঠে মেধার মন। উঠে বসেই নিধিকে ডাকে।

- এই নিধি, নিধি, তাড়াতাড়ি ওঠো। এই নিধি, মেলায় যাবে না? না উঠলে কিন্তু তোমাকে রেখে আমরা চলে যাবো।

ছোটো বোনকে ডেকে যাচ্ছে মেধা। নিধির আবার জাগতে খুব কষ্ট হয়। অনেকক্ষণ ধরে না ডাকলে সেই ডাক তার কানের গহ্বরে পৌছায় না। এই ডাকার শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল পাশের ঘরে থাকা মায়ের। এলেন এ ঘরে।

- এখনও তো অনেক সময় বাকি মেধা। ওকে ডাকছ কেন?

- বাবা বলেছেন উঠতে। নিধিকেও ডাকতে। মেলায় যেতে হলে আগে-ভাগে রেডি হতে হবে।

- কিন্তু তোমার বাবা তো ঘুমুচ্ছেন।

- আমাদের রেডি হতে সময় লাগে তো অনেক; কিন্তু বাবার তো আর সাজুগুজু করার দরকার নেই। তাই আরেকটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

কথা শুনে মা হাসলেন। ততক্ষণে নিধিও চোখ মেলেছে। সে পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। বেশ চঞ্চল। উঠেই বাবার পেট বরাবর একটা ঘুষি দিয়ে বলে, 'তোমাকেও উঠতে হবে। কী কী কিনতে হবে তার লিস্ট করতে হবে না?'

গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে হাঁটছে চারজন। হঠাৎ মেধার প্রশ্ন, 'আচ্ছা বাবা, এই বৈশাখি মেলা কেন হয়?'

বাবা বলতে শুরু করলেন, 'আমরা বাঙালিরা উৎসব প্রিয় জাতি। বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে উৎসবে মাতি আমরা। বাংলা নতুন বছর শুরুর প্রথম দিনটিও তেমন। এ দিনে আমাদে ইতিহাস-ঐতিহ্য, আর শিল্প-সংস্কৃতি তুলে ধরতে মেলার আয়োজন করা হয়।

- আচ্ছা বাবা, এই মেলা কবে শুরু হয়? মেধার কৌতূহলি প্রশ্ন।

- ইতিহাস বলে, ১৫৮৬ সালের ৫ই নভেম্বর থেকে শুরু হয় বাংলা সন গণনা। প্রথমে একে ফসলি সন বলা হলেও ধীরে ধীরে বঙ্গাব্দ হিসেবে পরিচিত হয়। সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলা নববর্ষ পালন শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে মেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সেখান থেকেই এসেছে বৈশাখি মেলা।

কথায় কথায় মেলার কাছাকাছি চলে এলো তারা। রং বেরঙের কাগজ, কাগজের ফুল আর বেলুন দিয়ে চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে এর প্রবেশ ফটক। উচ্ছ্বসিত মেধা ও নিধি। তাদের কণ্ঠে শোনা গেল 'ওয়াও'। ভেতরে ঢুকতেই দুপাশে চোখে পড়ল খেলনার দোকান। কাঠ ও প্লাস্টিকের পুতুল, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ, গরু, মহিষ আরো কত কী।

- 'আপু লিস্টটা বের করো।' মেধাকে মনে করিয়ে দিলো নিধি।

- 'লিস্ট লাগবে না'। দেখে দেখে পছন্দ করো আর হাতে নাও। মেধার পরামর্শ।

মেয়েদের কথা শুনে মিটিমিটি হাসছেন তাদের মা। প্রথম দোকান থেকে দুজনেই দুটি পুতুল নিল। এছাড়া মেধা একটা হাতি ও বাঘ আর নিধি নিল ঘোড়া আর হরিণ। ঢেঁকিও নিল দুজনে দুটো। মেলায় আসবে আর চরকি ঘুরাবেনা, তা কি হয়? দুজনের হাতে তাই একটি করে রঙিন কাগজে বানানো চরকিও উঠেছে এরই মধ্যে।

আরেকটু গিয়েই চোখে পড়ল অন্য ধরনের খেলনার আরেকটি দোকান। সেখানে রয়েছে বাঁশি, একতারা, ঢোল, কাঠের হারমোনিয়াম ইত্যাদি সংগীত সরঞ্জামসহ আরো নানান ধরনের খেলনা। দুজনেই একটা করে বাঁশি নিল। এছাড়া নিধি একটা একতারা আর মেধা নিল হারমোনিয়াম। পাশের দোকানে কাঠ ও মাটির গয়নাও নজর এড়ায়নি তাদের। এসব তো তাদেরই জিনিস। পছন্দের কিছু গয়না কিনল নিজেদের আর মায়ের জন্যও। বাদ

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গেল না নানা রঙের কাঁচের চুড়িও।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর এবার কিছু খাওয়ার পালা। সারি বেঁধে খাবারের দোকান। এসব দোকানে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পিঠা, নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, মুড়ির মোয়া, চিড়ার মোয়া, বিন্নিধানের খই, বাতাসা,কদমা, হাওয়াই মিঠাইসহ বেশ কিছু মিষ্টি জাতীয় খাবার। কোনটা রেখে কোনটা খাবে। যেন টেনসনেই পড়ে গেল দুই বোন। অবশেষে সমাধান দিলেন মা। নারকেলের পিঠা আর জিলাপি খেয়ে সব জাতের নাড়ু আর মোয়া কেনা হলো।

প্রচণ্ড ভিড়ের মেলায় শিশুদের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে প্রায়ই। বাবা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, কেউ যেন হাত না ছাড়ে। এ পর্যন্ত কেনা জিনিসগুলো বহনে দুটি হাতই ব্যস্ত বাবার। তাই দুই মেয়েকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন মা।

অদূরেই নাগরদোলা। মেলায় এসেছি আর নাগরদোলায় না চড়লেকি হয়? না, হয় না। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য এ নাগরদোলা। একবার, দুবার করে চার দফা চড়েও নামতে চাই-ছিল না নিধি। কিন্তু, আরো তো অনেক কিছু দেখার বাকি। অনেক বুঝিয়ে তাকে নামানো হলো মাটিতে। একে একে বায়োস্কোপ, পুতুল নাচও দেখল ওরা। গানের তালে তালে মাথাও নাড়ালো অবিরাম। সার্কাসে শিশু শিল্পীদের নানান খেলা দেখে যেন নির্বাক হয়ে গেল দুই শিশু। চোখ বড়ো বড়ো করে অপলক তাকিয়ে দেখল, কী করে নানান কসরতে দর্শকদের হাততালি কুড়াচ্ছে বাচ্চাগুলো। কখনও ছোটো-বড়ো রিংয়ের ভেতর দিয়ে ঝাপ দিয়ে পার হয়। কখনও বা একজনের কাঁধে একজন উঠে তৈরি করে পিরামিড। প্যান্ডেলের ছাদে টাঙানো এক দড়ি থেকে আরেক দড়িতে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কেউ বা আবার ছোট্ট একটি বাঁশের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

এ যেন এক ভিন্ন জগৎ দেখছে মেধা ও নিধি। দুপুর যে গড়িয়ে এল সে খেয়ালও যেন নেই। যেন হারিয়ে গেছে খিদেও। ওদিকে মায়ের খিদে পেয়েছে ভীষণ। মেলার ভেতরে খাবারের দোকানের অভাব নেই। কিন্তু লোকে লোকারণ্য। ভেতরে ঢোকাই যেন এক যুদ্ধের সমান। বেশ অনেকক্ষণ পর খেতে বসার সুযোগ পেল তারা। খাবার পর্ব শেষে আবার শুরু হলো মেলা দর্শন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়ল কাঠের তলোয়ার। ওরা টিভিতে দেখেছে, এই বস্তুটি দিয়ে লড়াই চলে। মেয়েদের আবদারে তাও কিনে দিলেন বাবা। সবার জন্য একটা করে তালপাতার পাখাও। প্রচণ্ড গরমে কাজে লাগছে বেশ।

কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে গানের সুর।

- 'বাবা, এত সুন্দর গান গায় কে?' মেধার জিজ্ঞাস্য।

- মেলার ভেতর থেকেই আসছে। হয়ত কোনো বাউল।

- বাবা চলো না, সামনে গিয়ে শুনি।

- গান শুনব বলেই তো এখনও মেলা থেকে বের হইনি। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য এসব গান আমাদের প্রাণের গান, মাটির গান। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি গানের দেশ বাংলাদেশ। তাই এগুলো বৈশাখি মেলারও অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

বেশ ক'টি গান শুনে মনে তৃপ্তি নিয়ে ওরা হাঁটা দিল বাড়ির পথে। ■

লেখক: গল্পকার ও সাংবাদিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বৈশাখের কবিতা

বোশেখ এল

আমিরুল হক

বোশেখ এল মহাসাজে
বিপুল আয়োজন
জীর্ণতা মুছে ফেলে
পুলকিত মন।

একে একে সুখে দুখে
কাটে বারো মাস
পুরনো বছর যায় হারিয়ে
ছড়িয়ে ফুলের বাস।

যেদিন যায় গত হয়
আসে নাকো ফিরে
এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার
মনকে রাখে ঘিরে।

ভালো মন্দে ছিল মিশে
হারানো দিনগুলো
নীরব সাক্ষী হয়ে আছে
পথের যত ধুলো।

নববর্ষ নতুন করে
সাজিয়ে দিক ধরা
সুখশান্তি সবার মাঝে
থাকুক হৃদয় ভরা।

বৈশাখ

মো. মাইদুল ইসলাম

এমনি আশা আর নিরাশায়
পহেলা বৈশাখ এল ফিরে,
কত ইচ্ছা ছিল উল্লাসের
বৈশাখ তোমাকে ঘিরে।
তোমার নিয়মে তুমি না এলে
কী করে শিখবে মানুষ,
শত দুঃখ ব্যথায় করে বর্ষবরণ
উড়াবে রঙিন ফানুস।
দূর করে সকল গ্লানি আর দীনতা
ভুলে চিত্তের যত দুঃখ ব্যথা,
মুছে ফেলে সব নিরাশা আর জড়তা
নববর্ষ বয়ে আনে আগামী সুখের বারতা।

পহেলা বৈশাখ

মঈনুল হক চৌধুরী

তাক দুম দুম তাক দুম দুম
বাজছে ঢোলক ঢাক,
বছর ঘুরে এলরে ভাই
পহেলা বৈশাখ।

গ্রাম-শহরে বসেছে মেলা
বিচিত্র সব নাম,
আনলো বোশেখ রং-বেরঙের
গাছেতে আম-জাম।

তাক দুম দুম তাক দুম দুম
নাগরদোলায় ওই,
খোকা-খুকু দুলছে দেখো
করছে যে হইচই।

হরেক রঙের মুখোশ পরে
গাইছে তারা গান,
দস্যি বোশেখ আউলা হাওয়ায়
করল সজীব প্রাণ।

তাক দুম দুম তাক দুম দুম
খুশির সীমা নাই,
প্রকৃতি আজ পালটে গেছে
বোশেখ এল তাই!

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নববর্ষের আহ্বান

গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

নব বরষে মন হরষে
গড়ি ডিজিটাল দেশটা
বিশ্বের বুকে উন্নত হতে
এসো করি সবে চেষ্টা।

উন্নয়নশীল দেশ হয়েছি
উন্নতদের পাশে রয়েছি
নতুন রূপে গড়ে তুলেছি
আমাদের পরিবেশটা
বিশ্বের বুকে উন্নত হতে
এসো করি সবে চেষ্টা।

একচল্লিশে উন্নত জাতি
চলব ফুলিয়ে বুকের ছাতি
সেই বাসনায় উঠেছি যে মাতি
নিয়ে বুকে সুখাবেশটা
লক্ষস্থলে এসো যাই চলে
করতে যাত্রা শেষটা।

ব্যর্থতা নয় সার্থক হয়
বাঙালি যদি কাজে হাত দেয়
শ্রম দিয়ে যায় ফেলে লাজ-ভয়
জানে না তো নিতে রেস্টটা।

হিংসা দ্বেষ ভুলে এসো সবে
গড়ি ডিজিটাল দেশটা।

শুভ নববর্ষ

মাসুদুর রহমান

বোশেখ এল আবার ফিরে
একটি বছর পরে
মনটা আমার সেই খুশিতে
উতাল পাতাল করে।
সবাই মিলে পান্তা ইলিশ
বাসায় বসে খাব
নিয়ম মেনে চলব সবাই
বাইরে নাহি যাব।
নববর্ষের নতুন দিনে
সবাই ভালো থেকো
রঙিন ফুলের শুভেচ্ছা দিলাম
আমায় মনে রেখো।

একাদশ শ্রেণি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি কলেজ, রাজশাহী।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিবনগর সরকার

খান চমন-ই-এলাহি

বাংলাদেশের শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব মানুষের জন্য এপ্রিল মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মুজিবনগর সরকার এই মাসে গঠিত হওয়ায় ও শপথ বাক্য পাঠের জন্য। তবে এ বছরের এপ্রিল মাস নানা রঙে নানা কারণে আরো বৈচিত্র্যময়। মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান যখন সর্বত্র, তখন এপ্রিল হয়ে ওঠে আরো নান্দনিক ও আরো আকর্ষণীয়।

আমরা বাঙালি ও বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা প্রিয়। কারণ স্বাধীনতা হলো জন্মগত অধিকার। এ অধিকারের জন্য বাঙালি পৃথিবীর বহু জাতির সাথে লড়াই করেছে। বৃটিশদের সাথে স্বাধীনতার লড়াই করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়। তখন বাংলাদেশ 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের মর্যাদায় বৃটিশদের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে তাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। বরং বাংলাদেশ বৃটেনের যেমন কলোনি বা উপনিবেশ ছিল, তেমন একটি উপনিবেশ বা কলোনি হয়ে ওঠে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চোখে। ফলে দীর্ঘ ২৪ বছরের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম করতে হয় বাঙালিদের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন পর্যন্ত একটানা সংগ্রাম চলে। দীর্ঘ ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও ২৫শে মার্চের ওয়ারলেস ম্যাসেজের নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এপ্রিল মাসে গঠিত স্বাধীন এই সরকারকে মুজিবনগর সরকার বলা হয়। এ সরকার মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে গঠিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালির দাবি-স্বাধীনতার কথা জানিয়ে দেয়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সেদিনের বৈদ্যনাথতলা আজ মুজিবনগর নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন জাগছে, কেমন ছিল মুজিবনগর সরকার ? কারা ছিলেন সেই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে ? কীভাবে আমরা সেই সরকারের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পেলাম ? বাংলাদেশ স্বাধীন করলাম ?

বঙ্গবন্ধুকে যখন পাকিস্তান সরকার গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তখন অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়ে বাংলার জনগণ। কিন্তু বাংলার জনগণ নেতা ও জাতির পিতার আদেশ মাথায় নিয়ে এগোয়। ফলে খুব বেগ পেতে হলো না। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু তো বলেছেনই, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার ম্যাসেজ বা তারবার্তার মাধ্যমে পাওয়া নির্দেশনাও আছে। পাকিস্তানি শাসকচক্র অন্যায়ভাবে-অবৈধভাবে- বেআইনিভাবে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে রাখেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সংকট সৃষ্টি হয়। এ সংকট নিরসনের জন্য ইন্দিরা গান্ধীও চিন্তিত হন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব চাইছিলেন। আর তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে মিলিত হন। এরপর বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণ, ২৬শে মার্চের ওয়ারলেস ম্যাসেজ এবং ইতোপূর্বের ধারাবাহিক সংগ্রামের সময়ে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহাকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে মুজিবনগর সরকারের যাত্রা শুরু হয়। ১০ই এপ্রিল গঠিত সর্বপ্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হয় ১৭ই এপ্রিল। এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আব্দুল মান্নান এম এন এ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম এন এ। সর্বপ্রথম গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন জাতির অভিভাবক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতি ও পাকিস্তান জেলে থাকার কারণে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দীন আহমদ। এম মনসুর আলী অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য, এ এইচ এম কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। যে সব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কারো ওপর ছিল না, সে সব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ওপর। এ সরকারের প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ পান কর্নেল এম এ জি ওসমানী। চিফ অব স্টাফ কর্নেল এম এ রব। আরো অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধুকে অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের কারাগারে আটকের বিরুদ্ধে নিন্দা জানায়। এতে বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তীব্র প্রতিবাদ জানায় বিবেকবান মানুষ ও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। এ সরকার মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পুরো দেশকে ১১টি সেক্টর ও ৩টি ফোর্সে বিভক্ত করে। শুধু তাই নয়, মুজিবনগর সরকার প্রশাসনকে ঢেলে সাজান, অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ সকল নাগরিককে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন, সাহায্য সহযোগিতা ও জনমত তৈরিতে উৎসাহিত করেন। ফলে মাত্র নয় মাসে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে, ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম, ১ কোটি শরণার্থী আর শোষণ নির্যাতনসহ বহুত্যাগ তিতিক্ষার পরে বিশ্ব মানচিত্রে অঙ্কিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পত পত করে উড়তে শুরু করে লাল-সবুজের পতাকা। সুরের ঝংকার তোলে আমার সোনার বাংলা ...।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও শপথের মধ্য দিয়েই বাঙালি ও বাংলাদেশ চূড়ান্ত লক্ষ্য-স্বাধীনতা অর্জন করে। আর অর্জিত স্বাধীনতা সার্থক হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে। ■

লেখক: ঔপন্যাসিক ও অ্যাডভোকেট

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র একটি নাম নয়– একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সত্তা, একটি ইতিহাস। তাঁর কারণেই বাঙালি জাতি আজ আত্মপরিচয়ে গর্বিত হয়ে বিশ্ব সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জাতিসত্তার প্রতীক এবং বাঙালিদের সকল প্রেরণার উৎস।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পাকিস্তান শাসন আমলে (১৯৪৭-৭১) সুদীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানির দুঃশাসন, অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন আর বঞ্চনার শিকার হয়ে বাঙালিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বাঙালির না ছিল নিজের কোনো অধিকার, না ছিল কথা বলার কোনো স্বাধীনতা। বাঙালির হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সকল অধিকার পাকিস্তানিরা নানা কৌশলে হরণ করে নিয়েছিল। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাঙালিরা পদে পদে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছে। সকল প্রকার লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নির্যাতন আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৮-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা-সংস্কৃতি আন্দোলন, '৬৬-এর ছয়দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনসহ সকল সংগ্রাম আর আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি '৭০-এর নির্বাচনে এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও গদিতে বসতে পারেননি। তাঁর সাথে পাকিস্তানিরা কতই না কুটকৌশল করে বাঙালিকে একের পর এক নির্যাতন করেই যেতে লাগল। এর জন্য বঙ্গবন্ধুকেও কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিতে হয়েছে। তাই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনতার মঞ্চে এক অনবদ্য ভাষণ দিলেন। এই ভাষণটিই ছিল শত সহস্র বছরের বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত বাঙালির অমোঘ নিয়ামক ও নিজেদের অধিকার আদায়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ইহা যেমন ছিল তীক্ষ্ণ তেমনই ছিল ক্ষুরধার এবং তেমনই ছিল হাড় কাঁপানো এক বজ্রকণ্ঠ। এ ভাষণটিতেই বাঙালির সকল বঞ্চনার ইতিহাস আর অধিকারের কথা তীব্র হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানিরা যতই ক্ষমতাধর হউক না কেন–বঙ্গবন্ধুর সেই বজ্রকণ্ঠই পাকিস্তানিদের শক্ত মজবুত ভীতকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল।

বাঙালিদের দীর্ঘ জীবনের দুর্দশার অনেক ছাপ, অনেক দিনের ঘটনা প্রবাহ বঙ্গবন্ধু খুবই দূরদর্শিতার সাথে এ ভাষণে তুলে ধরেছিলেন। কীভাবে মহান আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত করা যায় তারও সকল নির্দেশনা তাতে ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মহামন্ত্রও তাঁর ভাষণের প্রতিটি পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছিল। এই ভাষণের গুরুত্ব ও অসাধারণত্ব বহুমাত্রিক। তাই এ ভাষণটি বাঙালিদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের ইতিহাসেও ইহা অনন্য। যেসব কারণে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণ হয়েছে এর সবকিছুই বিবেচনা করে ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা Jacob F Field – তাঁর 'We Shall Fight on the Beaches;' The Speeches That Inspired History' গ্রন্থে বিশ্বের সেরা ৪১টি বক্তৃতা গ্রন্থণায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে যথাযথ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সঙ্গে তালিকাভুক্ত করেছেন। ইহা আপন মহিমায়ই বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে নিয়েছে। ইহা শুধু বাঙালির জাতীয় জীবনে নয়, বিশ্বের সকল অধিকার বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষকেও অনেক আশার আলো দেখায়।

এ ভাষণটিতে বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা এমনভাবে বলা হয় যে, বাঙালি জাতি যে-কোনো মূল্যে তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার চায়। যেমন ছিল ভাষার শৈলীতে সাবলীল, তেমন ছিল দেহভাষায়ও অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তেমনি ছিল শব্দের গাঁথুনিতে হৃদয়গ্রাহী এক অপূর্ব অনবদ্য কবিতা। বিশ্বের সকল মানুষের কানেই ধ্বনিত হয়েছে একটি অনবদ্য কবিতার মতো। তাৎক্ষণিকভাবে অলিখিত ভাষণটি এমন সব শব্দ চয়নের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে, সত্য সত্যই এক অনবদ্য কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ভাষণটি যতই শোনা যায় ততই শুধু শুনতে ইচ্ছে করে। এটি তাই চির অম্লান ও চির উজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি। যতবারই শোনা যায় ততবারই মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ় ও উদ্দীপ্ত করে নিয়ে যায় বিশ্বচেতনার এক মহাপ্রস্রবনে। সেই ভাষণের তাৎপর্য কেবলমাত্র শব্দের মাধুর্যতায় নয় সর্বাঙ্গীন দিক থেকেই ভাষণটি এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইহাকে বুঝতে হলে যেতে হয় মহাসমুদ্রের গভীরে। মহাসমুদ্রের গভীরে না গেলে কখনও রত্নের সন্ধান

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পাওয়া যায় না। যখন '৭১ এর ৭ই মার্চের ভাষণে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল বাংলার আকাশ-বাতাস। প্রতিটি শব্দের ঝংকারে প্রতিটি বাঙালির ধমনিতে প্রবাহিত হয়েছিল পাকিস্তানিদের প্রতিশোধে নেওয়ার অদম্য স্পৃহা। প্রতিটি শব্দ ও বাক্য বাঙালি জাতির হৃদয়ে জাগিয়েছিল অসীম সাহস আর অফুরন্ত শক্তি। যে শক্তি ও সাহসের কারণে বাঙালিরা জীবন-মরণপণ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

মঞ্চে দাঁড়িয়েই প্রথমে কবি বললেন–'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' একথা বলে পাকিস্তানিদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এ বাংলা তোমাদের নয়। বাংলার মানুষ তোমাদের আর কোনো কথাই শুনতে চায় না। বাঙালিরা কেবল দেশমাতৃকার মুক্তি চায়। তাই পাকিস্তানিরা তোমরা জেনো রাখো– তোমাদের কোনো ছলচাতুরি আর কাজে আসবে না। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিলেন–'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমার এদেশের মানুষের অধিকার চাই।' যার অর্থ এই যে, কোনো প্রলোভনই আর কাজে আসবে না। এটি বঙ্গবন্ধুর এক নির্লোভ উচ্চারণ। বঙ্গবন্ধুও তাদের কোনো প্রলোভনে পড়তে চাননি। কারণ বেঈমানের কোনো ঈমান নেই। কবি আরো কঠিন বাক্যে উচ্চারণ করে বললেন– 'আর যদি একটা গুলি চলে, আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো– ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' যার ফলে বাঙালিদের আর কোনো ভয় থাকল না। নির্ভীক বাঙালি আর ঘরে বসে থাকেনি। জীবনের মায়া ত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে চলে যায়। তিনি বজ্রকণ্ঠে আরো কঠোরভাবে বললেন–'ভাতে মারো, পানিতে মারো।' অর্থাৎ– আমরা ওদেরকে ভাতে আর পানিতে মেরেই কাবু করতে পারব। ওদেরকে আমাদেরও আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

তিনি তাঁর শব্দগুলো এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যে, তাঁর প্রতিটি শব্দই পাকিস্তানির হৃদয়ে বুলেটের মতো বিঁধে পাকিস্তানিকে তিলে তিলে দুর্বল করে ফেলেছিল। তাই কবিতার শব্দগুলো যে কত তেজোদীপ্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহার প্রতিটি শব্দই বজ্রের মতো কঠিন ও পাথরের চেয়ে ভারী লেগেছিল পাকিস্তানিদের কাছে। কবি আবারও দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–'মনে রাখবা: রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব–এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।' এমন কথায় কার না রক্ত গরম হয়। দীপ্ত শপথ না নিয়ে কে ঘরে বসে থাকতে পারে? ইহা কবিরও দীপ্ত শপথ। ইহা কবির নিজের প্রতি নিজের অবিচল আস্থারই বহিঃপ্রকাশ। কবি আরও বললেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ইহা পাকিস্তানিদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি। যে হুঁশিয়ারির কারণে পাকিস্তানিদের ভিত একেবারে নড়বড় হয়ে গিয়েছিল। মহাকবি কথাগুলি এমনভাবে উচ্চাররণ করলেন যে, তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিতেও ছিল নির্ভীকতার ছাপ। তাঁর এই নির্দেশনাই দেশকে স্বাধীন করার অসীম শক্তি ও সাহস যুগিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে। এ কবিতায় উজ্জীবিত হয়েই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছে। ইহার কত যে গতিধারা আর কত শক্তি তা মুখে বলে বুঝানো যায় না। ইহা একদিকে যেমন সাবলীল ভাষণ অন্যদিকে শব্দের অনুকরন এক অনবদ্য কবিতা। এর প্রগাঢ় টানে আজও বীর বাঙালি জেগে ওঠে, গায় স্বাধীনতার অমর সংগীত। বঙ্গবন্ধুর আকর্ষণীয় কণ্ঠ কারুকলায় উচ্চারিত তাঁর এ অমর কবিতাখানি আজও বিশ্বের সকল মানুষ বিমোহিত হয়ে শুনে এবং বিশ্ব প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে নব নব চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়।

বাংলার আকাশে বাতাসে আজও প্রতিধ্বনিত হয় বিশ্ব বিজয়ী অমর কাব্যের মন্ত্রমুগ্ধ শব্দকলায় উচ্চারিত সেই কালজয়ী অমর কবিতা। বাংলার সবুজ-শ্যামলিমায় শুনতে পায় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ভোরের পাখির সকালবেলার গান। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলির মহত্ত্বে জাগ্রত বাঙালি ভোরের আকাশে দেখতে পায় জেগে উঠা রক্তিম সূর্যের লাল আলোর রেখা। দেখতে পায় বাংলার নীল আকাশে লাল-সবুজের পতাকা আপন মনে পতপত করে উড়ছে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এই কবিতাই বাংলার মানুষকে নবচেতনায় আজ জাগ্রত করে তুলেছে। বঙ্গবন্ধু, আজ তোমার প্রিয় দেশবাসী জেগে উঠে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে– তোমার সোনার বাংলা জেগে উঠেছে তোমারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা, সততা, দূরদর্শিতা, সুগভীর চিন্তাচেতনা ও অসীম সাহসিকতায় দেশ আজ বিশ্বের দরবারে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য জননেত্রী সোনার বাংলাকে সোনার দেশে রূপান্তরিত করার জন্যই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

আজ আমরা তাঁরই নেতৃত্বে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি। বঙ্গবন্ধু, তোমার অসামান্য মানবিক গুণাবলি আজও বাঙালি জাতিকে যেমনিভাবে অনুপ্রাণিত করে, তেমনিভাবে তোমার অমর কবিতাখানি সকল সময়ই বাঙালি জাতিকে আলোর পথ দেখায়। তুমি যদি সেই দিন এ কবিতাখানি বাঙালিকে উপহার না দিতে তাহলে স্বাধীনতা লাভ করা বাঙালিদের পক্ষে কখনও সম্ভব হতো না। তাই আজ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা ও স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবিকে। তোমার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আলোকধারায় বর্ষিত হউক তোমার অমর কবিতার শাশ্বত বাণী– যে কবিতা বিশ্বের সমগ্র মানুষকে নব নব চেতনায় আজও জাগ্রত করে। আর এ অমর কাব্যের স্রোতোধারায় সুগম হউক বাঙালি জাতির আগামী দিনের পথচলা। ■

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধু

তাহসিন আহমেদ

বাঙালির হৃদয় জুড়ে
রয়েছে একটি নাম
তিনি হলেন সবার প্রিয়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

গরিবের বন্ধু ছিলেন
ছিলেন আপনজন
এমন মানুষ আর পাবো না
বঙ্গবন্ধুর মতন।

অনেক ভালোবাসতেন
দেশের মানুষকে
সুযোগ পেলেই জড়িয়ে ধরতেন
সব ব্যবধান ভুলে।

৮ম শ্রেণি, কুমিল্লা মর্ডান হাই স্কুল, কুমিল্লা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফিরে এল মসলিন

আরিফ রহমান

বাংলাদেশের আছে হাজার বছরের ইতিহাস । সেই সাথে জড়িয়ে আছে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। জীবনপ্রণালী, শস্য উৎপাদন, যানবাহন, বাড়িঘর যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, চিত্তবিনোদন সবকিছুতেই আছে ঐতিহ্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি ঐতিহ্য জানিয়ে দেয় আমাদের সমৃদ্ধির কথা। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলাদেশের নানা ঐতিহ্যের মধ্যে মসলিন অন্যতম । যার সুনাম পৃথিবী প্রতিটি কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পরেছিল। ঢাকাই মসলিনের নাম উচ্চারণ করলেই হাজারো মিথ ধরা পড়ে স্মৃতির পাতায়। কার্পাস তুলার সুতা থেকে তৈরি এই শাড়ি এতটাই মিহি ছিল যে একটি আংটির ভেতর দিয়েও এপারওপার করা যেত। আবার এ শাড়ি ভাঁজ করে রাখা যেত দিয়াশলাইয়ের বাক্সে ও। একবার ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন তৎকালীন বঙ্গদেশ ভ্রমণে। ফেরার সময় ফ্রান্সের রানির জন্য নিয়ে গেলেন এক আজব উপহার। একটি মাত্র দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে রানির সামনে উপস্থিত হলেন রাষ্ট্রদূত! সভাসদ সবাই অবাক। রানির হাতে এই উপহার তুলে দিতেই রানি ভীষণ অপমান বোধ করলেন। কিন্তু দেশলাইয়ের বক্স খুলতেই রানির সমস্ত রাগ, অপমান কর্পূরের মতো নিমেষেই উড়ে গেল। এ যে মসলিন! এত স্বচ্ছ, মিহি আর নজরকাড়া কাপড় তিনি কখনোই দেখেননি। নরম, পাতলা ও পরিধানে আরামদায়ক হওয়ায় অভিজাত নারীদের কাছে এ শাড়ির কদর ছিল বেশ। বহু বিদেশি পর্যটক বাংলা ভ্রমণে এসে মসলিনের বুনন কৌশল ও কাপড়ের নিপণতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। ইতিহাসে আছে, মোগল আমলে তৈরি করা ঢাকাই মসলিন ঘাসের ওপর রাখলে এবং তার ওপর শিশির পড়লে কাপড় দেখাই যেত না। কয়েক গজ মসলিন

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

কাপড় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যেত বলে জনসাধারণ একে 'হাওয়ার কাপড়' বলত। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলার তাঁতিরা কোনো 'মেশিন' ছাড়াই নিজেদের উদ্ভাবিত অতি সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি করে। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ৭৫ শতাংশ আয় হতো মসলিন রপ্তানির মাধ্যমে।

জগদবিখ্যাত এই শাড়ির বুনন ইংরেজি শাসনামলে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে কেবল জাদুঘরে দেখে মনের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে হয়েছে সবাইকে। মসলিন শিল্পীদের আঙুল কেটে দেওয়ার পরই নাকি ঢাকাই মসলিন তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই মসলিন নানা পথ হেঁটে আবার ফিরেছে নিজ ঘরে। প্রায় ১৭০ বছর পর আবার বাংলাদেশে বোনা হলো ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই মসলিন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাংলাদেশের একদল গবেষক দীর্ঘ ছয় বছর গবেষণা করে সক্ষম হয়েছেন ঢাকাই মসলিনের পুনর্জন্ম ঘটাতে। কী বিচিত্র উপায়ে সংগ্রহ করা হলো মিহি মসলিনের উপাদানগুলো। সেই গল্পটাই আজ তোমাদের জন্য।

ঢাকাই মসলিনের শেষ প্রদর্শনী হয়েছিল লন্ডনে ১৮৫০ সালে। বাংলাদেশে আবার বোনা হলো সেই ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই মসলিন কাপড়ের শাড়ি। ঠিক সে রকমই, যেমনটি বলা হতো আংটির ভেতর দিয়ে গলে যায় আস্ত একটি শাড়ি। ইতিমধ্যেই ঢাকাই মসলিন জিআই স্বত্বের অনুমোদন পেয়েছে। ২০১৬ সালে জামদানি প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২০ সালে মসলিনকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

ভারতে আজও মসলিন তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকাই মসলিনের বিশেষত্বই আলাদা। তাই তো ঢাকাই মসলিন তৈরির জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন একদল গবেষক। কিন্তু শুরুতে এক টুকরা 'অরিজিনাল' মসলিন কাপড় জোগাতে কলকাতা থেকে লন্ডন পর্যন্ত ছুটতে হয়েছে গবেষকদের। 'ফুটি কার্পাস' তুলার গাছ খুঁজে বের করা থেকে হস্তচালিত তাঁত সবই নতুন করে করতে হয়েছে বিচিত্র সব পন্থা অবলম্বন করে।

২০১৪ সালের অক্টোবরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মসলিনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় মসলিন সুতা তৈরি হতো, তা জেনে সে প্রযুক্তি উদ্ধারের নির্দেশনা দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমিটি গঠন করে।কাজের শুরুতে মসলিন কাপড় বা তুলার কোনো নমুনাই গবেষকদের কাছে ছিল না। তাঁদের প্রথম কাজ ছিল যে তুলা থেকে সুতা কেটে মসলিন শাড়ি বোনা হতো, সেই তুলার গাছ খুঁজে বের করা। সেই গাছটি আসল ফুটি কার্পাস কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার মসলিন কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। এই দুটি জিনিস জোগাড় করাই এই প্রকল্পের প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। কিন্তু হাতে কোনো মসলিন কাপড়ের নমুনা নেই, নেই ফুটি কার্পাসের কোনো চিহ্নও।ছিল শুধু কিছু তথ্য-উপাত্ত।ফুটি কার্পাস বন্য অবস্থায় বাংলাদেশে কোথাও টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে গাছটি খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রথমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার এক শিক্ষার্থীকে দিয়ে এর ছবি আঁকানো হয়। সেই ছবি দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিটিভিতে প্রচার করা হয়।এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে গাজীপুরের কাপাসিয়া ও রাঙামাটি থেকে এই গাছের খবর আসে। গবেষকেরা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ৩৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা হিসেবে নেওয়া হয় গাছের তুলা, বীজ, পাতা, কাণ্ড ও ফুল। গবেষকেরা কাপাসিয়ার একটি গাছের জাতের সঙ্গে স্কেচের (আঁকা ছবির) মিল পান।

মসলিন সংগ্রহ

স্থানীয় উৎস থেকে মসলিন কাপড় সংগ্রহ করার জন্য ২০১৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এরপর দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৮টি কাপড়ের নমুনা পাওয়া যায়। গবেষক দল নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে ৩০০ বছর আগের শাড়িও পেয়েছেন। পরে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তা আসলে পুরনো সিল্কের কাপড়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

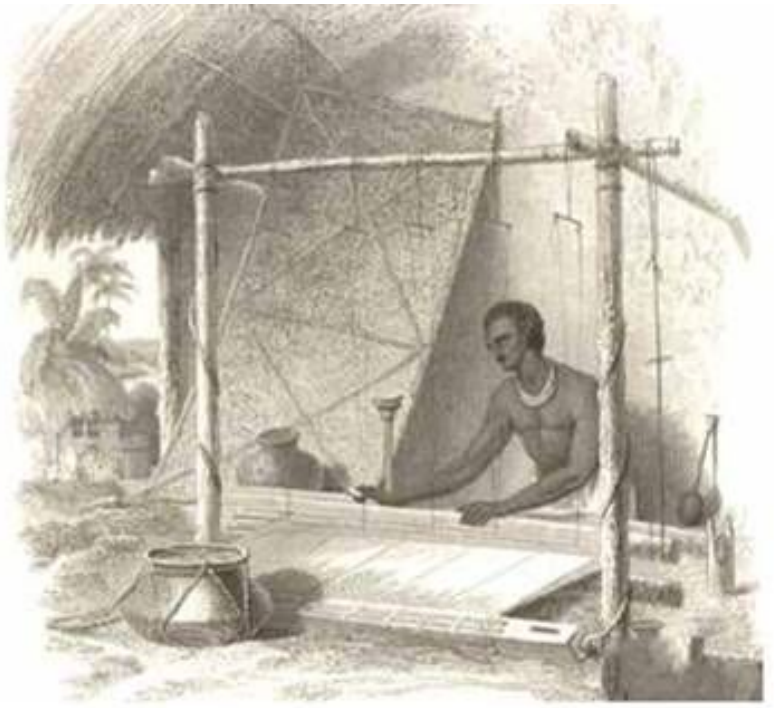

গবেষকদের দরকার ছিল চার বাই চার ইঞ্চির এক টুকরো ঢাকাই মসলিন কাপড়। দেশের অন্য কোনো উৎস থেকে মসলিনের নমুনা না পেয়ে তাঁরা জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে যান কিন্তু জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে থাকা মসলিন থেকে তুকরা দিতে অপারগতা জানান। একপর্যায়ে মসলিনের নমুনা সংগ্রহের জন্য ভারতের ন্যাশনাল মিউজিয়াম কলকাতায় যান। ভারতে গিয়ে বিফল হয়ে গবেষক দল হতাশ হয়ে পড়ে। এই খবর শুনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গবেষকদের লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে যেতে বলেন। তিনি সেখানে ঢাকাই মসলিন দেখে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত মসলিনের একটু নমুনার জন্য ২০১৭ সালের জুলাইয়ে একটি দল লন্ডনের ওই মিউজিয়ামে যান। সেখান থেকে মসলিনের কাপড়ের নমুনা সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যউপাত্ত তাঁরা পেয়ে যান। লন্ডন থেকে সংগৃহীত মসলিন কাপড়ের ডিএনএ সিকুয়েন্স বের করা হয়। গবেষকেরা এই মসলিনের ডিএনএর সঙ্গে আগে সংগৃহীত কাপাসিয়ার একটি জাতের ফুটি কার্পাস গাছের মিল পান। তাঁরা নিশ্চিত হন, সেটিই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জাতের 'ফুটি কার্পাস'। সম্ভাব্য ফুটি কার্পাসের এই জাতটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের নিজস্ব মাঠে ও আইবিএসসির মাঠে চাষ করা হয়।

এবার সুতো কাটার পালা

সাধারণত ৫০০ কাউন্ট সুতা দিয়ে মসলিন কাপড় বোনা হতো। একটি শাড়িতে ১৪০ থেকে ১৫০ গ্রাম সুতার প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের প্রশিক্ষিত সুতা কাটুনিরা পাঁচ দিনে এক গ্রাম সুতা কাটতে পারেন। অর্থাৎ এই গতিতে একজন যদি মসলিনের জন্য সুতা কাটতে থাকেন, তাহলে একটি শাড়ি জন্য সুতা তৈরি করতে তাঁর প্রায় দুই বছর লাগার কথা।তুলা থেকে ৫০০ কাউন্টের সুতা তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই সুতা আধুনিক যন্ত্রে কাটা যাবে না, চরকায় কাটতে হবে।এবার খোঁজ শুরু হয় দেশের কোথায় এখনো তাঁতিরা চরকায় সুতা কাটেন। খবর আসে, কুমিল্লার চান্দিনায় এখনো এই তাঁতিরা রয়েছে। গবেষকেরা সেখানেই ছুটে যান। তাঁরা ভাবেন, এমন তো হতে পারে যে তাদের পূর্বপুরুষদের কেউ মসলিন সুতা কেটেছিলেন। বহুদিন ঘোরাঘুরির পর তাঁরা হাসু ও নূরজাহান নামের অশীতিপর দুই বৃদ্ধার সন্ধান পান। তাঁরা বলতে পেরেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা মসলিন সুতা কাটতেন। তাঁদেরও ছোটবেলায় মিহি সুতা কাটার স্মৃতি রয়েছে। কিন্তু তাঁরা তো এখন সুতা কাটতে পারেন না।, শেষ পর্যন্ত তাঁরা মোটা সুতা কাটুনিদের নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের দিয়ে সুতা চিকন করার প্রতিযোগিতা করে ছয়জন সেরা সুতা কাটুনি বের করতেই প্রায় দুই বছর সময় লেগে যায়।তারপর এই সুতা কাটার জন্য চরকা তৈরি করা হয়।

তিন আঙুলের জাদু

শুধু সুতা কাটলেই হবে না তা হতে হবে মিহি । সুতা মিহি করার ব্যাপারটা আসলে তিন আঙুলের জাদু। তিন আঙুলে কীভাবে তুলা ছাড়তে হবে, সেটাই আগে আবিষ্কার করতে হয়েছে। আর নারীদের আঙুলেই এই সুতা সবচেয়ে মিহি হয়। তিনটি আঙুলকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নরম করে রাখতে হয়। প্রথমে তাদের আঙুলগুলো শক্ত ছিল। অনুভূতি ছিল না। পরে তাদের আঙুলের 'ট্রিটমেন্ট' করতে হয়েছে। সন্ধ্যারাতে তিনটি আঙুলে লোশন মাখিয়ে রেখে সকালে সুতা কাটা হতো। আর সবসময় আঙুল তিনটির যত্ন নিতে হয়েছে। যাতে এই তিন আঙুলে কোনো আঁচড় না লাগে বা এই তিনটি আঙুল দিয়ে অন্য কোনো জিনিস কাটাকুটির কাজ ওরা না করে

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সেদিকে সর্বদা নজর রাখতে হয়েছে। আবার কখনো কাজ করতে গেলে আঙুল ঘেমে যেত, তখন আবার পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হতো। আর চরকা চালানোর ফাঁকে তাঁরা কতটুকু সুতা ছাড়বেন, এ ব্যাপারে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একাগ্রতা তৈরি করা হয়েছে। কারণ এর যান্ত্রিক কোনো মাপ নেই। সম্পূর্ণ মনোযোগের মাধ্যমেই চরকার ঘূর্ণনের সঙ্গে সুতা ছাড়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

বুনোনের পূর্বপ্রস্তুতি

চিকন সুতা। ঘর্ষণ থেকে ক্ষয় রোধের জন্য মাড় দেওয়া প্রয়োজন । একপর্যায়ে তাঁরা চিকন ধানের খইয়ে মাড় ব্যবহার করে কাজ করতে হয়েছে। আবার মাড় দিয়ে নাটাইয়ে জড়াতে গিয়ে বারবার সুতা ছিঁড়ে যায়। কীভাবে করলে ছিঁড়বে না। সেটাও বের করা হলো। শুকানো হলো। ববিনে ভরতে গেলেও বারবার ছিঁড়ে যায়। প্রতিটি পদক্ষেপই নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়েছে। টানা তৈরি করতে গিয়েও একই অবস্থা।বিমের মধ্যে সহজভাবে যাতে ববিন ঘুরতে পারে, এ জন্য কাঠামোগত দিকটা ঠিক করে নিতে হয়। চিকন সুতার কারণে আঙুলে লেগেই সুতা ছিঁড়ে যায়। আধা ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টা ধরে করতে হয়েছে। বেশি শীতেও কাজ হয় না বেশি গরমেও হয় না। মাটির গর্তে তাঁত বসিয়ে করা হয়। কারণ মাটির আর্দ্রতার সঙ্গে মসলিনের একটা সম্পর্ক আছে। সুতা বারবার ছিঁড়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য বালতিতে পানি রেখেও কাজ করতে হয়েছে।

অবশেষে বোনা হলো

দুই তাঁতিকে কাপড় বোনাতেও ধাপে ধাপে অনেক কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে। প্রথমে একটি তাঁত করা হয়েছিল। পরে তিনটি করা হয়েছে। এই তাঁতেই রুবেল ও ইব্রাহিম ১৭১০ সালে বোনা শাড়ির নকশা দেখে হুবহু একটি শাড়ি বুনে ফেলেন।ইতিমধ্যে তাঁরা মোট ছয়টি শাড়ি তৈরি করেছেন। একটি শাড়ি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।প্রথম অবস্থায় শাড়িটি তৈরি করতে খরচ পড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। গবেষকদের প্রত্যাশা, এই খরচ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে।

প্রথম খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতকেই রোম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে অভিজাত রোমান নারীরা ঢাকার মসলিন পরতে ভালোবাসতেন। সেই থেকে মসলিনের মসলিনের পথ চলা শুরু হয়েছিল । বাংলা মসলিন শব্দটি এসেছে 'মসুল' থেকে। ইরাকের এক বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র হলো মসুল। এই মসুলেও অতি সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হতো। এই মসুল ও সূক্ষ্ম কাপড়ড়এ দুয়ের যোগসূত্র মিলিয়ে ইংরেজরা অতি সূক্ষ্ম কাপড়ের নাম দেয় 'মসলিন'। অবশ্য বাংলার ইতিহাসে 'মসলিন' বলতে বোঝানো হয় তৎকালীন ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের কাপড়কে। ফুটি কার্পাস নামক গাছের তুলা থেকে তৈরি করা হতো এই সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়। ভিন্ন জাতের এই তুলার বৈজ্ঞানিক নাম ছিল'গসিপিয়াম আরবোরিয়াম ভার নেগলেক্টা'

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

(Gossypium Arboreum Var Neglecta কার্পাস থেকে তুলা সংগ্রহ করার জন্য, বীজসহ কার্পাসকে বোয়াল মাছের চোয়ালের দাঁত দিয়ে বানানো চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে তুলা থেকে অপদ্রব্য আলাদা করে নেওয় হতো। এই কাজে দরকার হতো দক্ষতা আর ভীষণ ধৈর্য। আর মসলিন কাপড় বোনার ক্ষেত্রে তুলা থেকে সুতা তৈরি ও সুতা দিয়ে কাপড় বোনা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক ছিল। ঠান্ডা ও শীতল আবহাওয়ার আর্দ্রতা মসলিনের সুতা কাটার জন্য বেশ উপযোগী। ফলে নাতিশীতোষ্ণ বাংলার আবহাওয়া মসলিন কাপড় বোনার জন্য বেশ উপযোগী ছিল। বৃহত্তর ঢাকা জেলার প্রায় সব গ্রামেই তাঁতশিল্প ছিল। তবে কয়েকটি স্থান ছিল উৎকৃষ্ট মানের মসলিন তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ। এগুলো হচ্ছে: ঢাকা জেলার ঢাকা ও ধামরাই, গাজীপুর জেলার তিতাবদি, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এবং কিশোরগঞ্জ জেলার জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর।

হাতে চালানো তাঁতেই তৈরি হতো মসলিন। তাই একেকটি মসলিন তৈরিতে দীর্ঘ সময় লাগতো। সাধারণভাবে এক টুকরো ভালো মানের মসলিন তৈরিতে একজন তাঁতি ও তার সহকারীর ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন হর দরকার ছিল। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তাতে নকশা, ফুল কিংবা অন্যান্য অনুষঙ্গ জুড়ে দিতে আরো বেশি সময় লাগত। কখনো কখনো প্রাচীন মসলিন শাড়ীতে ৭০০ থেকে ৮০০ কাউন্টের সুতার বুনার কাজটি করা হতো । ফলে শাড়ী গুলো হতো সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ।

মসলিনের প্রকারভেদ

অভিজাতের প্রতীক হিসেবে এবং সৌন্দর্য ও ব্যবহারের প্রকার ভেদে বিভিন্ন নামে মসলিন কাপড় প্রসার লাভ করে । এসো জেনে নেই কত রকম ছিল মসলিন।

মলবুস খাস: বাদশাহ বা স্রমাটদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হতো এ কাপড়। মলবুস খাস মানে হলো আসল কাপড়। ১৮'শ শতকের শেষের দিকে মলবুস খাসের মতো আরও একটি উন্নত কাপড় তৈরি করা হয়েছিল। যার নাম ছিল 'মলমল খাস'। কাপড়গুলো দৈর্ঘ্য ছিল ১০ গজ এবং প্রস্থে ছিল ১ গজ আর ওজন হত ৬-৭ তোলা। যা একটি আংটির মাঝে অনায়াসে আনানেওয়া করা যেত। সাধারণত এই কাপড়গুলো রপ্তানি করা হতো ।

সরকার-ই-আলা: মসলিনের এই কাপড়টিও ছিল বেশ উন্নত । বাংলার নবাব বা সুবাদারদের জন্য তৈরি হতো সরকার- ই- আলা মসলিন। সরকার-ই-আলা নামের জায়গা থেকে পাওয়া খাজনা দিয়ে এর দাম শোধ করা হত বলে এই মসলিনের নামকরণ এইভাবে করা হয়েছে। লম্বায় হতো ১০ গজ, চওড়ায় ১ গজ আর ওজন হত প্রায় ১০ তোলা ।

ঝুনা: 'ঝুনা' শব্দটি এসেছে হিন্দি শব্দ ঝিনা থেকে, যার অর্থ হলো সূক্ষ্মা কাপড়। ঝুনা মসলিনও সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরি করা হতো, তবে সুতার পরিমাণ থাকত কম । তাই এ জাতীয় মসলিন হালকা জালের মতো হতো দেখতে। একেক টুকরা ঝুনা মসলিন লম্বায় ২০ গজ, প্রস্তে ১ গজ হতো। ওজন হতো মাত্র ২০ তোলা। এই মসলিন বিদেশে রপ্তানি করা হতো না, পাঠানো হতো মোঘল রাজ দরবারে। সেখানে দরবারের শাহাজাদা বা হারেমের নারীরা গরমকালে মসলিনের তৈরি জামা গায়ে দিতেন।

আব-ই-রওয়ান : আব-ই-রওয়ান ফার্সি শব্দ-এর অর্থ প্রবাহিত পানি। এই মসলিন কাপড়ের সূক্ষ্মতা বোঝাতে প্রবাহিত পানির মতো টলটলে উপমা থেকে এর নাম করণ করা হয় 'আব-ই-রওয়ান' । লম্বায় হতো ২০ গজ, চওড়ায় ১ গজ, আর ওজন হত ২০ তোলা।

খাসসা: ফার্সি শব্দ খাসসা। এই ধরনের মসলিন কাপড় ছিল মিহি আর সূক্ষ্ম, অবশ্য বুনন ছিল ঘন। ১৭ শতকের দিকে সোনারগাঁ বিখ্যাত ছিল খাসসা মসলিনের জন্য। তাছাড়া ১৮ থেকে ১৯ শতক সময়ে জঙ্গলবাড়িও বিখ্যাত ছিল এ মসলিনের জন্য। তখন একে 'জঙ্গল খাসসা' বলা হতো। অবশ্য ইংরেজরা একে ডাকত 'কুষা' বলে।

শবনম : 'শবনম' কথাটার অর্থ হলো ভোরের শিশির। ভোরে শবনম মসলিন শিশিরভেজা ঘাসে শুকোতে দেয়া হতো বলে এই নাম দেয়া হয়েছিল। এই মসলিন এতটাই মিহি আর সূক্ষ্ম ছিল যে দেখায়ই যেত না তো। শবনম দেখতে অনেকটা কুয়াশার মতো ছিল। ২০ গজ লম্বা আর ১ গজ প্রস্তের শবনমের ওজন হত ২০ থেকে ২২ তোলা।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নয়ন সুখ : মসলিনের এই কাপড়টির নাম একমাত্র বাংলা শব্দের অভিধান থেকে এসেছে। সাধারণত গলাবন্ধ রুমাল হিসেবে এর ব্যবহার হতো। এ জাতীয় মসলিনও ২০ গজ লম্বা আর ১ গজ চওড়া হতো।

বদন খাস : বদন অর্থ শরীর আর খাস অর্থ বিশেষ। এ ধরনের মসলিনের নাম থেকে ধারণা করা হয়, খুব সম্ভবত শুধু জামা তৈরির জন্য এ মসলিন ব্যবহার করা হতো । বদন খাসের বুনন ঘন হতো না। এই কাপড় ২৪ গজ লম্বা আর দেড় গজ চওড়া হতো ও ওজনে হতো ৩০ তোলা।

সর-বন্ধ: ফার্সি শব্দ সর-বন্ধ যার অর্থ হল 'মাথা বাঁধা' । সর-বন্ধ মসলিন কাপড় দিয়ে প্রাচীন বাংলার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। এই মসলিন কাপড় লম্বায় ২০-২৪ গজ আর চওড়ায় আধা থেকে এক গজ হতো; ওজন হতো ৩০ তোলা।

ডেডারিয়া: এই মসলিন কাপড়টির বৈশিষ্ট্য ছিল ডোরা কাটা । তার জন্য এই মসলিন কাপড় 'ডোরিয়া' বলে পরিচিত ছিল। লম্বায় ১০-১২ গজ আর চওড়ায় ১ গজ হতো। শিশুদের জামা তৈরি করে দেয়া হত ডোরিয়া মসলিন কাপড় দিয়ে।

জামদানি: আগেকার যুগে 'জামদানি' বলতে বোঝানো হতো নকশা-করা মসলিনকে। প্রাচীনকালের মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে জামদানি শাড়ি বাঙালি নারীদের অতি পরিচিত। সেই সময় মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হতো।

এই সকল মসলিন ছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রকারের মসলিন ছিল: 'রঙ্গ', 'আলিবালি', 'তরাদ্দাম', 'তনজেব', 'সরবুটি', 'চারকোনা' ইত্যাদি। ২০০ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া ঢাকাই মসলিনের ইতিহাস আজও আমাদের মনে দাগ কেটে যায়।

মুঘলদের পরাজিত করে বাংলা দখল করল ব্রিটিশরা। রাজ্য ক্ষমতা দখলের পূর্বেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের বিলেতি শাড়ির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হলো ঢাকার মসলিন। তাই তারা মসলিনকে চিরতরে দূর করে দিতে চাইল। প্রথমেই তারা মসলিন কাপড়ের উপর অত্যধিক শুল্ক বা ট্যাক্স চাপিয়ে দিল। বিলেত থেকে আমদানি করা কাপড়ের উপর শুল্ক ছিল ২-৪%। কিন্তু মসলিনসহ দেশি কাপড়ের উপর তারা ট্যাক্স বসাল ৭০-৮০%। ফলে দেশে যেমন বিলিতি কাপড় সুলভ হলো, একই সাথে ব্যয়বহুল হয়ে উঠল মসলিনসহ দেশি কাপড়। প্রতিযোগিতায় মসলিন টিকতে পারছিল না। কিন্তু তারপরও কোনো রকমে টিকেছিল মসলিন। এবার ইংরেজ শাসকগণ নিষেধাজ্ঞা জারি করল মসলিন তৈরির উপর। তাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেও চলল মসলিনের উৎপাদন। তখন ব্রিটিশরাজ চড়াও হলো মসলিনের কারিগরদের উপর। তারা মসলিন কারিগরদের ধরে ধরে তাদের হাতের আঙ্গুল কেটে দেয়া শুরু করল যাতে গোপনে গোপনে তারা মসলিন তৈরি করতে কিংবা এর নির্মাণকৌশল অন্যদের শিক্ষা দিতে না পারে। আর এভাবেই একদিন বাঙালি হারিয়ে ফেলল তাদের গর্বের মসলিন তৈরির প্রযুক্তিজ্ঞান। বর্তমানে মিরপুরের একমাত্র জামদানিই মসলিনের দূর সম্পর্কিত শ্রেণি হিসেবে টিকে আছে।

আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে মসলিন শিল্পের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই শিল্প আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। বিশ্বদরবারে বাঙালিকে একটি সংস্কৃতিসমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় এই ঐতিহ্যের ঢাকাই মসলিন। তাই সুযোগ এসেছে আবারও বাঙালির সমৃদ্ধ এই শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার। আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করতে হবে এই শিল্পকে এবং ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য ও নিজস্বতার ধারক এই মসলিন শিল্পকে। ■

লেখক : প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

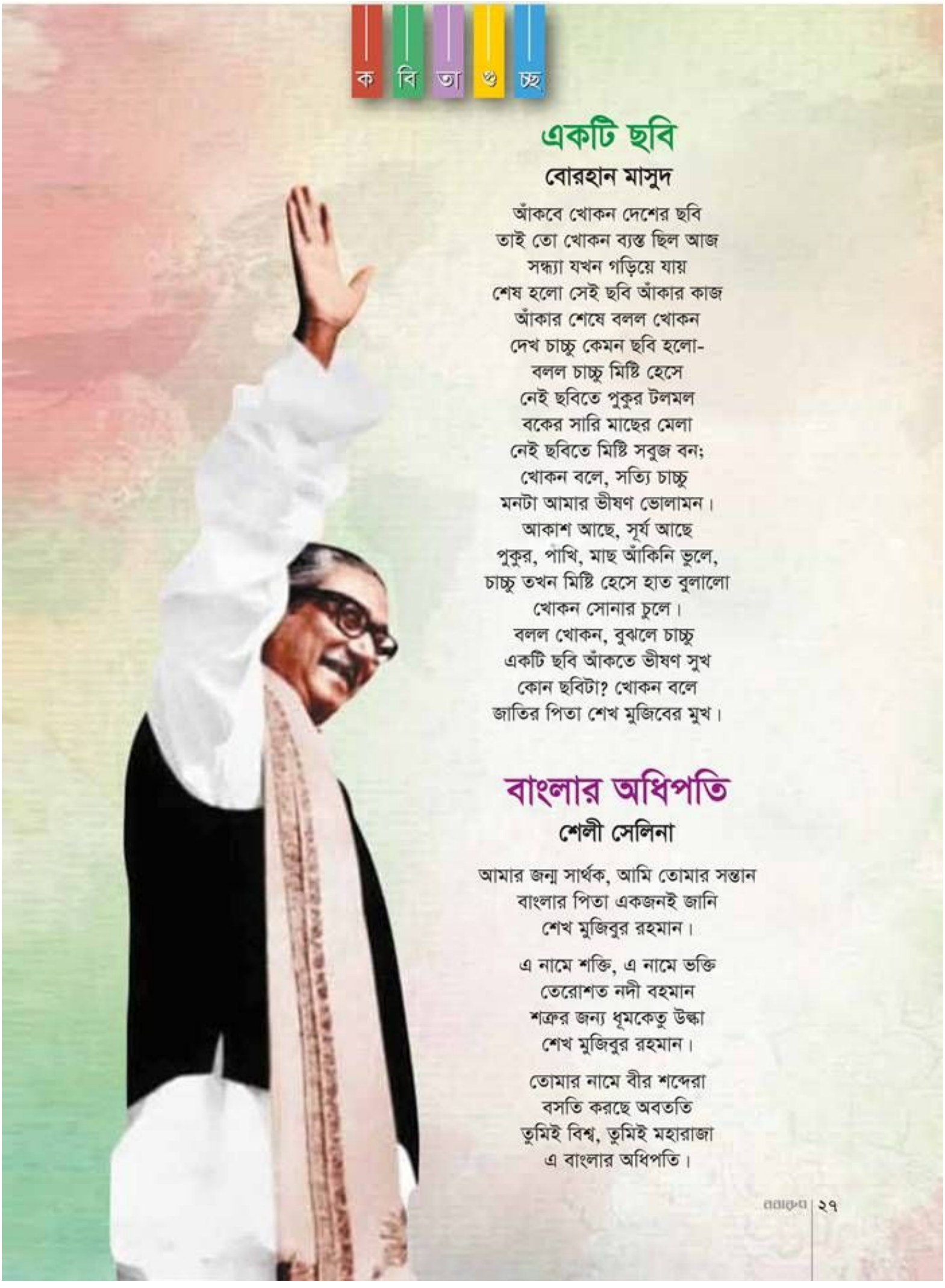

একটি ছবি

বোরহান মাসুদ

আঁকবে খোকন দেশের ছবি
তাই তো খোকন ব্যস্ত ছিল আজ
সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে যায়
শেষ হলো সেই ছবি আঁকার কাজ
আঁকার শেষে বলল খোকন
দেখ চাচ্চু কেমন ছবি হলো-
বলল চাচ্চু মিষ্টি হেসে
নেই ছবিতে পুকুর টলমল
বকের সারি মাছের মেলা
নেই ছবিতে মিষ্টি সবুজ বন;
খোকন বলে, সত্যি চাচ্চু
মনটা আমার ভীষণ ভোলামন।
আকাশ আছে, সূর্য আছে
পুকুর, পাখি, মাছ আঁকিনি ভুলে,
চাচ্চু তখন মিষ্টি হেসে হাত বুলালো
খোকন সোনার চুলে।
বলল খোকন, বুঝলে চাচ্চু
একটি ছবি আঁকতে ভীষণ সুখ
কোন ছবিটা? খোকন বলে
জাতির পিতা শেখ মুজিবের মুখ।

বাংলার অধিপতি

শেলী সেলিনা

আমার জন্ম সার্থক, আমি তোমার সন্তান
বাংলার পিতা একজনই জানি
শেখ মুজিবুর রহমান।

এ নামে শক্তি, এ নামে ভক্তি
তেরোশত নদী বহমান
শত্রুর জন্য ধূমকেতু উল্কা
শেখ মুজিবুর রহমান।

তোমার নামে বীর শব্দেরা
বসতি করছে অবততি
তুমিই বিশ্ব, তুমিই মহারাজা
এ বাংলার অধিপতি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ভূতের রসগোল্লা

নাহার আহমেদ

রাত দুপুরে ধন্যি বুড়ির
ঘুমটা ভেঙে যায়
গুড় গুড় গুড় আওয়াজ কানে
শুনতে বুড়ি পায়।
ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে
দেখল বাতি জ্বেলে
অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ
থাকল দুচোখ মেলে।
বিরাট বিরাট রসগোল্লার
চার চারটে হাঁড়ি
কে যে এসে রেখে গেছে
এগুলো তার বাড়ি।
ভাবল বুড়ি হয়ত এসব
ভূত-পেত্নির কাজ।
খাবো না আর ওসব এখন
থাকুক পড়ে আজ।
অমোন মজার মিষ্টি দেখে
জিভেতে জল এল
ভোর না হতেই উঠে বুড়ি
গোটা দশেক খেল।

নতুন রূপে আকাশ

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

রাতের আকাশ তারায় ভরা
দৃশ্য এসব নজর কাড়া
চাঁদটাও দেখার মতো
আশপাশে তারা শত শত।

জীবন আমার হচ্ছে ধন্য
এসব দৃশ্য দেখার জন্য
চাঁদের জোছনায় বসে থেকে
বাতাসগুলো ধরে জেঁকে
চাদের শুভ্র আলো গায়ে মেখে,
মন ভরে চাঁদ দেখে,
জীবন আমার ধন্য
এসব দেখার জন্য।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা।

ঘড়ি

শফিকুল আলম সবুজ

একটা ঘড়ি রোজ সকালে
ভেঙে দিল ঘুম,
সকাল থেকে সন্ধ্যা চলে
কাজ করে সে ধুম।
ইশকুলে যায় ঘড়ির কাঁটায়
বাড়ি ফিরি ঠিক,
এই কাটাতে খুঁজি আমি
সূর্য উঠার দিক।
সূর্য উঠে ঠিক সকালে
সন্ধ্যা হলে ডুব,
ঘড়ির কাটায় জীবন চলে
প্রয়োজন তার খুব।

মশা

আমানুল্লাহ আমান

বাম বাহুতে মহা-আনন্দে
একটি মশা বসে,
যেই না কামড় অমনি তারে
দিলাম কিল কষে।

দুষ্টু মশা কামড় দিয়েই
হাওয়ায় উড়ে চলে,
ফোসকে গিয়ে বাম বাহুতে
লাগল সেই কিল।

পালিয়ে গিয়ে মশা আমায়
ভাবছে বুঝি বোকাই,
বাহুর ব্যথায় এখন আমি
বসে বসে কোকাই।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

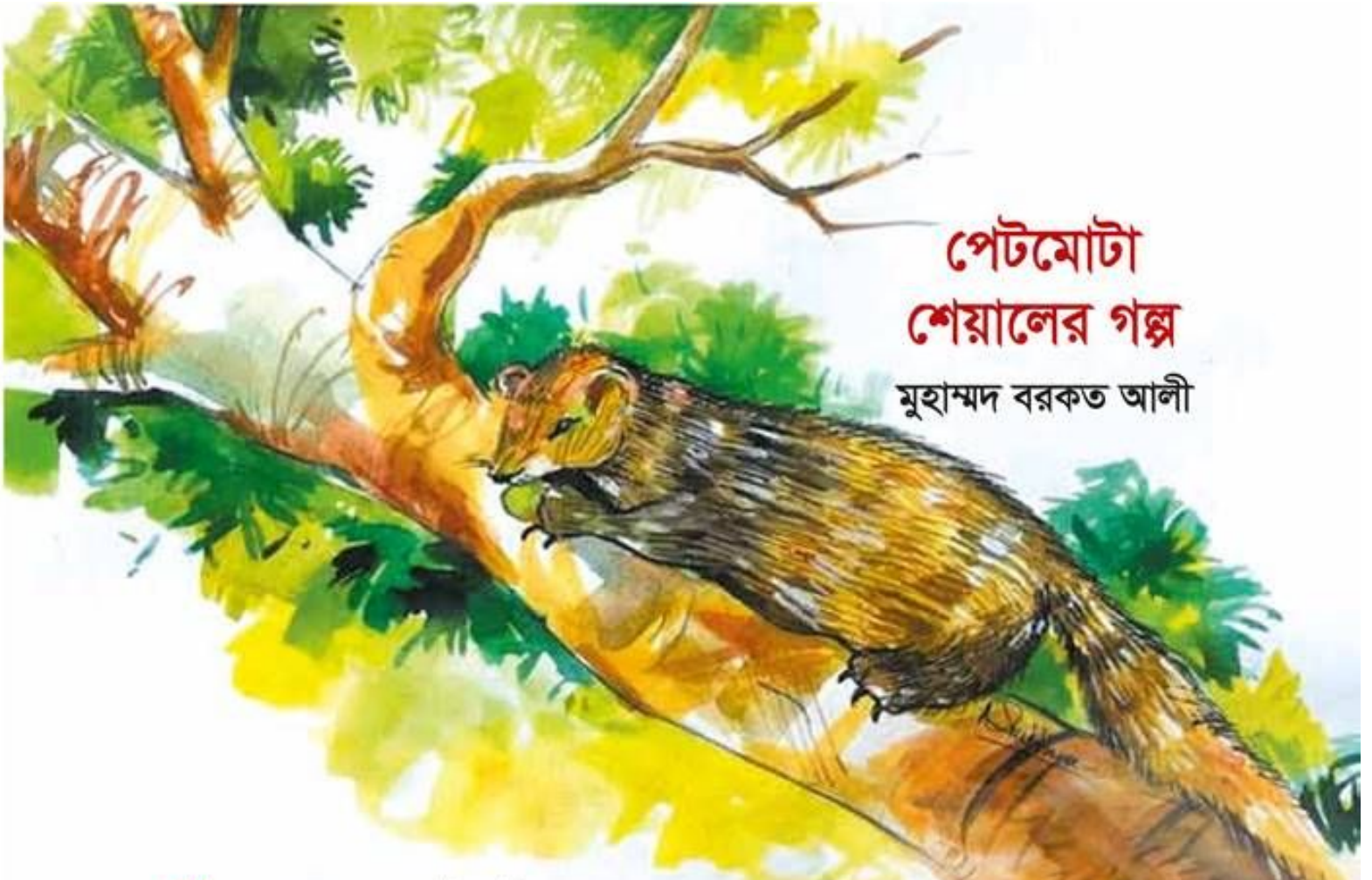

পেটমোটা শেয়ালের গল্প

মুহাম্মদ বরকত আলী

শ্যামলছায়া গ্রামের পাশেই একটা বড়ো ঘন বন ছিল। সেই বনে নানারকমের পশুপাখি, জন্তু, জানোয়ার বসবাস ছিল। কী ছিল না সেই বনে? বাঘ, ভাল্লুক,বানর, সিংহ, হাতি আরো অনেক কিছুই। সেই বনে একটি শেয়াল আর একটি বেজি একসাথে থাকত। কারণ তারা দুজনেই খুব ভালো বন্ধু ছিল। একদিন সকালবেলা দুই বন্ধু বের হলো খাবারের খোঁজে। বনের ভেতরে একটা কুল গাছ (বরই গাছ) ছিল। শেয়াল আর বেজি দুই বন্ধু সেই কুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে কুল খাবে বলে। শেয়াল তো আর গাছে উঠতে পারবে না, তাই বন্ধু বেজিকে বলল, 'বন্ধু, তুমি গাছে উঠে পড়ো। তুমিও কুল খাও আর আমাকেও দাও।'

বেজি তরতর করে কুল গাছে উঠে পড়ল। বেজি গাছে উঠে এ ডালে যায় ও ডালে যায় আর পাকা পাকা কুল খায়। শেয়াল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলে, 'ও বন্ধু, আমাকে কুল দাও।' বেজি শেয়ালের কথা কানেই তুলল না। শেয়াল যে তার বন্ধু সে কথা তার মনেই পড়ল না। বেজি এ ডালে ও ডালে গিয়ে, ভালো ভালো পাকা পাকা কুল খেতেই থাকে। আর শেয়াল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে কুল চাইতেই থাকে। 'বন্ধু বন্ধু, একটা কুল দে।' বেজি একটাও কুল দেয় না। কিছু কিছু কুল বেজির হাত-মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে। শেয়াল সেই কুলগুলো আর কুলের আঁটি (বীজ) খেয়ে নিজেকে শান্ত্বনা দেয়। এভাবে এক সময় শেয়ালের প্রচণ্ড রাগ হয়। রাগে-দুঃখে শেয়াল কুল গাছের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে বেজি কুল খেতে খেতে পেটমোটা করে গাছের এক ডালে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে গাছের উপর থেকে বেজিটা ধপাস করে নিচে পড়ল। শেয়ালের মাথায় রাগ চেপে ছিল অনেক আগে থেকেই। তাই খিদে পেটে রাগের মাথায় তার বন্ধু

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বেজিকে খপ করে ধরে খেয়ে ফেলল। বন্ধুকে খেয়ে শেয়াল মাঠে বেড়াতে বের হলো। একটা রাখাল গরু চড়াচ্ছিল। শেয়াল সেই আইল দিয়ে হাঁটছিল। রাখাল শেয়ালটাকে দেখে বলল, 'কত বড়ো পেটমোটা শেয়াল।' শেয়াল এই কথা শুনে বলল,

'পেটমোটা পেটমোটা বলবিনি,
কুল খেয়েছি, কুলের আঁটি খেয়েছি,
বন্ধুকে খেয়েছি, তোকেও খাব।'

এই কথা বলেই রাখাল আর গরু দুটোই খেয়ে ফেলল শেয়াল। পেটটা আরো মোটা হয়ে গেল। আবারও সামনের দিকে চলল। এবার একজন খড়ি কুড়ানি মেয়ে দেখল শেয়ালটাকে। খড়ি কুড়ানি মেয়েটা বলল, 'শেয়ালটার পেট এত মোটা ? পেটমোটা শেয়াল।'

শেয়ালের রাগ আরো দ্বিগুণ হয়ে গেল। শেয়াল বলল,

'পেটমোটা পেটমোটা বলবিনি,
কুল খেয়েছি, কুলের আটি খেয়েছি,
বন্ধুকে খেয়েছি, রাখালসহ গরু খেয়েছি,
তোকেও খাব।'

কথাটা শেষ করতেই শেয়াল খড়ি কুড়ানিকেও খেয়ে ফেলল। শেয়ালের পেট আরও আরও মোটা হয়ে গেল। মোটাপেট নিয়ে হেলে দুলে আস্তে আস্তে সামনের দিকে যেতে লাগল। পথের মধ্যে দেখা একজন লোকের সাথে। লোকটা কাঁধে লাঙল-জোয়াল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে জমি চাষ করতে। সাথে দুইটা গরু আছে। শেয়ালটা দেখতে পেয়ে বলল, 'বাপরে বাপ, এত পেটমোটা শেয়াল তো আগে কখনো দেখিনি।'

শেয়াল শুনতে পেল সে কথা। শেয়াল বলল,

'পেটমোটা পেটমোটা বলবিনি,
কুল খেয়েছি, কুলের আঁটি খেয়েছি,
বন্ধুকে খেয়েছি, রাখালসহ গরু খেয়েছি,
খড়ি কুড়ানি মেয়েকে খেয়েছি
তোকেও খাব।'

ব্যাস, খেয়ে ফেলল। এখন তো শেয়াল আরও মোটা হয়ে গেল। একদম বেলুনের মতো। শেয়াল এবার নড়তেই পারে না এমন অবস্থা। তবুও চলতে থাকল।

মাঠের ফাঁকা জমিতে একটা ছাগল তার চারটা বাচ্চা নিয়ে ঘাস খাচ্ছিল। বাচ্চারা শেয়ালটাকে দূরে থেকে দেখতে পেয়ে নিজেরা বলাবলি করল,

'দেখ দেখ শেয়ালের পেটটা কত মোটা।'
শেয়াল আগের মতো রেগে গিয়ে বলল,

'পেটমোটা পেটমোটা বলবিনি,
কুল খেয়েছি, কুলের আঁটি খেয়েছি,
বন্ধুকে খেয়েছি, রাখালসহ গরু খেয়েছি,
খড়ি কুড়ানি মেয়েকে খেয়েছি,
লাঙল মানুষ বলদ খেয়েছি,
তোদেরকেও খাব।'

বাচ্চাদের মা তখন কিছুটা দূরে ছিল। শেয়াল তার বাচ্চাদের খেয়ে ফেলল সেটাও দেখল। ছাগলটা এবার দৌড় লাগালো। সে কী দৌড়। তোমরা ভাবছ ভয়ে পালাচ্ছে? আরে না। ছাগলটা এক দৌড়ে পৌছালো এক কামারের বাড়ি। কামারকে সবকিছু খুলে বলল। কামারকে বলল, আমায় দুটো লোহার ছুঁচালো শিং বানিয়ে দাও না। কামারের দয়া হলো। ছাগলের মাথায় দুটো লোহার ছুঁচালো শিং লাগিয়ে দিল। লোহার শিং লাগিয়ে ছাগল এক দৌড়ে চলে এল শেয়ালের কাছে। শেয়াল তখন একটা গাছের নিচে বসে খাবারগুলো হজম করতে চেষ্টা করছিল। ছাগলটা এসে বলল, 'পেটমোটা শেয়াল, পেটমোটা শেয়াল।' শেয়াল রেগে মেগে আগুন হয়ে একই কথা ছাগলকে বলল। বলে যেই না খেতে যাবে তখনি ছাগল তার লোহার শিং দিয়ে শেয়ালের পেটে দিল একটা গুঁতা। এক গুঁতায় শেয়ালের পেট গেল ফেটে। পেট থেকে বের হলো, কুল, কুলের আঁটি, বন্ধু বেজি, রাখাল, খড়ি কুড়ানি মেয়ে, লাঙল মানুষ বলদ, আর ছাগলের বাচ্চারা। সকলেই যে যার মতো দৌড়ে চলে গেল। শেয়ালটা মরে পড়ে রইল। ছাগল তার বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেল।

শিক্ষা: লোভ মানুষকে ধ্বংস করে। কখনো লোভ করবে না। ■

লেখক : গল্পকার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

যাঁর নেতৃত্বে চারুকলা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র ঢাকা আর্ট ইন্সটিটিউট এর বর্তমান নাম চারুকলা অনুষদ। এই চারুকলার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। কীভাবে শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে গড়ে উঠে ঢাকা আর্ট ইন্সটিটিউট থেকে আজকের চারুকলা অনুষদ। তার আদি ইতিহাস জেনে নাও আজকের নিবন্ধে-শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন খুব ছোটোবেলা থেকেই আঁকতে ভালোবাসতেন। তার যা দেখতেন তাই যেন হুবহু এঁকে ফেলতেন। এসব দেখে তার আশপাশের সবাই খুব অবাক হতেন।

জয়নুলের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার কেন্দুয়ায়। এটি বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত। জয়নুলের মা জয়নাবুন্নেসা আর বাবা তমিজউদ্দিন। বাবা ছিলেন পেশায় পুলিশ অফিসার। নয় ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিলেন জয়নুল এবং সবার থেকে ভিন্ন চরিত্রেরও ছিলেন তিনি। তার বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে লেখাপড়া শিখে বড়ো কিছু হবে কিন্তু জয়নুলের স্বপ্ন ছবি আঁকা নিয়ে। তথাকথিত পড়াশুনা তার মোটেও ভালো লাগে না।

একদিন কোনো একজনের কাছে থেকে জানতে পারলেন যে, কলকাতায় শুধু ছবি আঁকিয়েদের জন্য একটি স্কুল আছে। সেখানে হাতে ধরিয়ে ছবি আঁকা শেখানো হয়। এটি শোনার পর থেকে তার মন ছটফট করছে সে স্কুলটি দেখার জন্যে। কিন্তু বাড়ির কেউ রাজি হলেন না তাকে নিয়ে যেতে। কোনোভাবে একবার বন্ধুদের নিয়ে চলে গেলেন সে স্কুল দেখতে। স্কুলটির নাম কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন মহাকাণ্ড। চারদিকে সবাই যে যার মতো আঁকাআঁকি নিয়ে ব্যস্ত। কেউ প্রকৃতির ছবি আঁকছে, কেউ মানুষ আঁকছে। সবার হাতেই রংতুলি। কী সুন্দর স্কুল! এখানে খাতার পৃষ্ঠায় ছবি আঁকলে কেউ বকা দেয় না।

বাড়ি ফিরে জয়নুলের স্কুলের পড়াশুনায় আর মন বসছে না। তার শয়নে স্বপনে শুধু কলকাতার সেই আর্ট স্কুল। মাঝে মাঝে ভাবতেন আমাদের এখান কেন এরকম স্কুল নেই। একদিন সে ঘোষণা দিয়ে দিল, যে এখানের স্কুলে আর পড়বে না। সে কলকাতায় যেতে চায়। এই শুনে তো তার বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। ছেলের এ কেমন আবদার সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা।

জয়নুলের যেই ভাবা সেই কাজ। একদিন অভিমান করে মাধ্যমিক পরীক্ষা বাদ দিয়েই ১৯৩৩ সালে কলকাতায় চলে গেলেন। তবে জয়নুলের মা চেয়েছিলেন ছেলে কলকাতায় পড়াশুনা করুক। তাই গোপনে তিনি জয়নুলকে কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। সেখানে ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করে কলকাতার গভর্ণমেন্ট স্কুল অফ আর্টসে পড়াশুনা করেন। সেখানে চিত্রকলার পাশাপাশি তিনি শিল্পকলাও শিখেন। এই দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি পড়াশুনার জন্য কলকাতায় কাটান ঠিক কিন্তু মন পড়ে থাকত পূর্ববঙ্গে তার ছায়াঘেরা পাখি ডাকা গ্রাম ব্রহ্মপুত্রের নদের পাড়ে। কিন্তু পড়াশুনায় সে একটুও ফাঁকি দিতেন না। এভাবেই তিনি ১৯৩৮ সালে কলকাতায় গভর্ণমেন্ট

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

অফ আর্টসের ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করে স্নাতক পাস করেন। সে বছরই জয়নুলের আঁকা একটি ছবি সর্ব ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে ব্যাপক সারা ফেলে। ছবিটি এতই জনপ্রিয় হয় যে এই ছবির জন্য তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

এরপর তাঁকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। প্রতিদিন নিজের মনের মতো ছবি এঁকে ভালো সময় পার করছিলেন হঠাৎ ১৯৪৩ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এদেশের মানুষরা খাদ্যের অভাবে মরে যাচ্ছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত প্রতিবাদী হয়ে উঠে। জয়নুলও তার প্রতিবাদের পথ খুঁজে নেন ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে। দুর্ভিক্ষ শেষ হয়। ইংরেজরা চলে যায় দেশ ছেড়ে। তবে যাবার আগে দেশ ভাগ করে রেখে যায় ভারত ও পাকিস্তান। জয়নুল ফিরে আসেন নিজ ভূমি পূর্ববঙ্গে। তখন এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

জয়নুল ফিরে এসে দেখলেন তাঁর ছোটোবেলার পূর্ববঙ্গ শিল্পকলায় যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে। এখন যদি ছোট্ট কোনো জয়নুলের শিল্পী হওয়ার শখ জাগে তো সে কী করবে। দেশ ভাগের কারণে আর ইচ্ছে করলেও কলকাতায় যেতে পারবে না। তাই ছোটোবেলার লালিত স্বপ্নের পথে এগোলেন তিনি।

১৯৪৮ সালে পুরান ঢাকার জনসন রোডে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের একটি পুরোনো বাড়িতে মাত্র ১৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে তিনি ঢাকা আর্ট ইন্সটিটিউটের যাত্রা শুরু করেন। জয়নুল আবেদীন ছিলেন এই স্কুলের প্রথম শিক্ষক। ১৯৫১ সালে স্কুলটা সেগুনবাগিচার একটি বাড়িতে স্থানান্তর হয়। অবশেষে ১৯৫৬ সালে শাহবাগে একটি স্থায়ী জায়গা পায় জয়নুলের আর্ট স্কুলের স্বপ্ন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬১ সালে এই স্কুলকে প্রথম শ্রেণির সরকারি কলেজের মর্যাদা দেন। তখন এটির নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। জয়নুল আবেদীন ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জোড়ালো ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে এই কলেজের নাম হয় বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৮৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদ হিসেবে গৃহীত হয়। আজকের প্রজন্ম যেটিকে চারু ও কারুকলা হিসেবে চেনে পরে ২০০৮ সালে চারুকলা অনুষদ হিসেবে এর পথচলা শুরু হয়।

বর্তমানে চারুকলা অনুষদে চালু আছে ৮টি বিভাগ গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওরিয়েন্টাল আর্ট, সিরামিকস, ড্রয়িং ও পেইন্টিং, ভাস্কর্য, কারুশিল্প, হিস্টোরি অব আর্টস ও প্রিন্টমেকিং। চারুকলা ইন্সটিটিউট ভবনের নকশা করেন খ্যাতনামা শিল্পী মাজাহারুল ইসলাম। সবুজ প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা সারি বেঁধে ছবি আঁকার চর্চা করছে। কেউ কাঠ কেটে ফুটিয়ে তুলছে আকৃতি কেউবা পাথর দিয়ে গড়ছে অবয়ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চারুকলা অনুষদের উদ্যোগেই প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে ঢাকা শহরের শাহবাগ-রমনা এলাকায় মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। যা বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আগরতলা বইমেলায় ডিএফপি

নুসরাত জাহান

বই আমাদের মনের দর্পণ। আমাদের জীবনের বড়ো বন্ধু। আমাদের চেতনার দিশারি। বই জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাই বই-এর কোনো বিকল্প নেই। বই ছাড়া জীবনযাপন করা যায় না। তবে আগের দিনের তুলনায় আজকাল মুঠোফোনের দৌলতে বই কেনার চাহিদা কিছুটা কমে গেছে বলতেই হয়। কেননা এই ছোট্ট বাক্সে আমরা সবই পেয়ে যাচ্ছি। তবুও যারা পড়েন তারা ঠিকই বই কেনেন ও পড়েন। ভারতের ক্রিপুরা রাজ্যের ৩৯তম আগরতলা বইমেলায় যেয়ে মূলত তাই মনে হয়েছে।

এই বইমেলা শুরু হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে। জিও পাওয়ার পর আমরা দুইটি গ্রুপে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় যাই। আমরা যাত্রা করি ৩রা মার্চ সকালে। যদিও এই কোভিড পরিস্থিতিতে যথারীতি আগের দিন কোভিড টেস্ট করে পরের দিন রওনা দেই। আগরতলা বইমেলায় এবারের ভাবনা ছিল 'আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা'।

রাজণ্যশাসিত ত্রিপুরা একটি 'গ' শ্রেণির রাজ্য হিসেবে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রে যোগ দেয় ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে। তখন ত্রিপুরার ভৌগোলিক আয়তন ছিল ১০৪৯১৬৯ বর্গ কিলোমিটার । এই আয়তনের নিরীখে (সিকিমকে বাদ দিলে) ত্রিপুরাই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী হচ্ছে আগরতলা।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ঋতুরাজ বসন্তের গগনে আগরতলা বইমেলার উৎসব শুরু। পলাশ কৃষ্ণচূড়ার আবহে ফাল্গুনের মাসে বইমেলা শুরু হয়। মিষ্টি মধুর সময় বইমেলার এই সময়টা।

আগরতলায় গিয়ে আমরা যে হোটেলে উঠি সেখান থেকে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের দূরত্ব ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। হোটেল থেকে অটোরিকশা বা সিএনজিতে বইমেলায় যেতে সময় লাগতো প্রায় ৩০ মিনিট। শহর থেকে বেশ দূরে মেলার প্রাঙ্গণ। এতে যদিও আমাদের তেমন অসুবিধা হয়নি বরং ভালোই লেগেছে। শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখা হয়েছে। ৩৯তম আগরতলা বইমেলায় ঢুকতেই প্রথমেই চোখে পড়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বই উন্মোচনের মঞ্চটি। গেইটের সামনে

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সিকিউরিটি গার্ডের হাতে রাখা স্যানিটাইজার সবার হাতে দিয়ে দিচ্ছিল।

প্রতিদিন মেলা ২.৩০মি: থেকে শুরু হয়ে চলে রাত ৯টা পর্যন্ত। প্রতিদিনই থাকত দেখা ও শোনার মতো নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন । যাতে নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক, মুকাভিনয় সবই থাকত। আমাদের দলের সবাই নির্দিষ্ট সময়ে মেলায় চলে যেতাম। প্রতিদিনই আমাদের 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নের' স্টলে উপচে পড়া ভিড় ছিল। বই প্রেমিদের একটি বাড়তি আকর্ষণ ছিল আমাদের স্টলের প্রতি। বিশেষ করে ছোটোদের। তারা খুব আগ্রহ নিয়ে আমাদের নবারুণ ও অন্যান্য বইগুলোর পাতা উলটিয়ে উলটিয়ে দেখেছে ও বই কিনেছে। এতে বাংলাদেশের প্রতি ওখানকার মানুষের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে ভীষণভাবে। তারা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেক কিছু জানতে চেয়েছে।

৮ই মার্চ তারিখে আমরা ২য় দলের সবাই ত্রিপুরাস্থ উদয়পুরে যাই এবং সেখানে কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পরিদর্শন করি। এছাড়াও অন্য দিনগুলোতে আমরা ত্রিপুরার রাজবাড়িসহ অন্যান্য নিদর্শনগুলো ঘুরে দেখি।

৩৯তম আগরতলা বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ১১ই মার্চ। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, গভর্নর, বিধায়ক ও অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা এই কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সবার ৩৯তম বইমেলায় অংশগ্রহণকে এবং যারা এই মেলার আয়োজন করেছেন (তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর) তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। বক্তারা বাংলাদেশকে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু বলে উল্লেখ করেন। তারা বাংলাদেশের বইমেলায় অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মেলায় সহকারী হাইকমিশনার জনাব জোবায়েদ হোসেন বক্তব্য রাখেন। এইভাবে আমাদের মেলায় ১০ দিনের অংশগ্রহণ শেষ হয়। ■

রাফিকুল ইসলাম, ৭ম শ্রেণি, বাঘড়া স্বরূপ চন্দ্র পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সিগঞ্জ

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

মাসিক খেলাঘরের-এর পথচলা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

খেলাঘর, কী মিষ্টি নাম। শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নপুরী। তবে এই খেলাঘরে আমরা পুতুল খেলি নাই, বনভোজন করি নাই সত্যি, কিন্তু কৈশোরের স্বপ্নগুলো কাব্য-কথায় লিখে খেলাঘরের রঙিন পাতাগুলো সাজিয়ে ছিলাম। আঙুলের কড়া গুণলে প্রায় সত্তর বছর হবে।

হ্যাঁ, খেলাঘর একটি মাসিক পত্রিকার নাম। পত্রিকাটি বের হয়েছিল ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার ৯ নয়াপল্টন থেকে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বেগম জেব-উন নিসা আহমদ। সেকালে এই পত্রিকাটি দুই বাংলার শিশু-কিশোর ও অভিভাবকদের কাছে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পশ্চিম বাংলার লিখিয়ে বন্ধুরা পত্রিকাটিতে নিয়মিত লিখতেন। আর পূর্ব বাংলার এমন কোনো লেখক ছিল না, যারা খেলা-ঘরের পাতায় লিখেননি। অনেকের প্রথম লেখাটি খেলাঘরের পাতায় ছাপা হয়েছে। যদ্দুর জানি আজকের প্রয়াত লোকবিজ্ঞানী ও বাংলা একাডেমির সভাপতি শামসুজ্জামান খানের প্রথম লেখা 'অভিনব ডাকাত' প্রথম ছাপা হয়েছিল এই খেলাঘরের পাতায়।

আমরা যখন লেখালেখি শুরু করি, তখন ঢাকা থেকে শাহেদ আলীর সম্পাদনায় মাসিক সবুজ পাতা হোসেন কামালের সম্পাদনায় মাসিক মুকুল, রোকনুজ্জামান খানের সম্পাদনায় মাসিক কচি কাঁচা ও এখলাস উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় মাসিক টাপুর টপুর বের হতো। আমি এসব কাগজে নিয়মিত লিখতাম অজো গ্রাম থেকে। তবে খেলাঘর বেশি মন টানত। লেখা ডাকযোগে পাঠালেই ছেপে দিতেন জেবু আপা। খেলাঘরের বৈশিষ্ট্যই ছিল গ্রামেগঞ্জের নতুন লিখিয়েদের লেখা ছাপা এবং হাত পাকিয়ে লেখক তৈরি করা। শুধু লেখক তৈরিই নয়, শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ঐতিহ্য ও স্বদেশ চেতনা বোধ জাগ্রত করা ছিল পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। প্রকাশিত ছড়া, কবিতা, গল্প, নাটিকা ও প্রবন্ধ এসব বিষয়ের ছাপ প্রতি সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল।

এছাড়া নিয়মিত ছাপা হতো জীবনী আবিষ্কারের কাহিনি, গোয়েন্দা কাহিনি, শিকার কাহিনি, রহস্য কাহিনিসহ শিশু মনোরঞ্জক বিভিন্ন ধরনের রচনা। এছাড়া খেলাঘরের প্রতি সংখ্যার গ্রাহকদের পাতা ও নতুনদের বৈঠক নামে দুটি বিভাগ ছিল।

মাসিক খেলাঘর ১৯৫৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। তবে পঁচাত্তরের পর এটির প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে যায়। ২৭টি বছর পত্রিকাটি বের হবার পর পচাঁত্তরে হঠাৎ অর্থনৈতিক কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়। আমি বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগারে মাসিক খেলাঘরের থরে থরে সাজানো বিশটি বছরের খেলাঘর দেখেছি। খেলাঘর ছিল সম্পূর্ণভাবে একটি বেসরকারি পত্রিকা।

আটচল্লিশ ও বায়ান্নর পরে একুশকে নিয়ে লেখা ছাপা ছিল সাহসের ব্যাপার। খেলাঘরে পঞ্চার পর থেকে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' শিরোনামে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন ও মাতৃভাষার ওপর নিয়মিত লেখা ছাপা হতো। রঙে রেখার ছবিতে খেলাঘর ছিল ছোটোদের প্রিয় পত্রিকা। অঙ্গসজ্জা ও বিষয় নির্বাচনে খেলাঘর ১৯৬৭ সালে যুক্তরাজ্যের ইয়ার বুকে সগর্বে স্থান করে নেয়। সেকালে প্রকাশিত দিগদর্শন পশ্চাবলী, রহস্য সন্দর্ভ বিশ্বদর্শন, বালকবন্ধু, বালক হিতোষী, সখা, বালক, শ্রীহট্ট সুহৃদ, সাথী, অঞ্জলী, প্রকৃতি, সখী বালক, শেরে বাংলা তোষিণী, সোপান, সন্দেশ, শিশু, ধ্রুব, বাল্যশ্রম, উৎসাহ, পার্ব্বণী, আঙুর, শিশু সাথী, রাজভোগ, পাটিয়া, খেলার সাথী, উদ্যম, অরুণী যাদুময়, বেনু, রামধনু, শিশুমহল, চিত্রা, ছাত্রসখা, গল্পগাথা, ছোটদের লেখা, নব আলোক, সাজি, কিশোরী, রং মশাল, কৈশোরিকা, ভাইবোন, শিশু সত্তগাত, ফুল ঝুরি, আবাহনী, কচি-কথা, রুপকথা, হুল্লোড়, সেতারা, শাহীন, পাঠশালা, রোশনাই, কিশোর ভারতী, শিশু বান্ধবসহ অনেক পত্রিকার মতো মাসিক খেলাঘর উভয় বাংলার শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে আলাদা স্থান করে নেয়। ■

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

বোকা কাকের কাণ্ড

তারিকুল ইসলাম সুমন

গলফের মাঠটি যেন দৃষ্টিনন্দন পার্ক। প্রায় প্রতিদিন ঘাস কেটেছেঁটে ছোটো রাখা হয়। পশ্চিমে দেয়ালের ওপারে যশোর বিমানবন্দর রানওয়ে। ফাগুন মাস এলেই উত্তরের লেকটির পানি শুকিয়ে নিচে নেমে যায়। এখানেই চরে বেড়ায় একঝাঁক হাঁস। হাঁসগুলো বেশ দূর থেকে আসে এখানে । দল বেধে চরে বেড়ায়। পাড়ে উঠে পালক চুলকায়, আবার অনেক সময় পালকে ঠোঁট গুঁজে বিশ্রামও করতে দেখা যায়।

কয়েকটি কাক লেকের চারপাশে ঘুরঘুর করে। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকায়, দুপায়ে হাটে। কখনো কখনো ছোটো আমগাছটির ডালে চুপচাপ বসে থাকে। হাসঁগুলো এখানে দিন পার করে আবার ফিরে যায় নির্দিষ্ট বাড়িতে। ওদের প্রায়ই এক সারিতে যেতে দেখা যায়।

লেকের পাড়ে মাঝেমধ্যে দু-একটি হাঁস ডিম পাড়ে। সবুজ ঘাসের বুকে সাদা ডিম যেন ঝকঝক করে। ঝুপড়ি আমগাছটির ডালে বসে থাকা কাকটি ঘাসের বুকে ডিম দেখলেই নিচে নেমে আসে। খুশিতে কাকের চোখ আনন্দে হেসে ওঠে। মাথার তুলনায় বড়ো ঠোঁটটি দিয়ে ঠোকর বসিয়ে দেয়। ঠোঁট ঢুকিয়ে দেয় ডিমের ভেতর। চুকচুক করে খেয়ে নেয় খোসার ভতরের অংশ। দু-তিনটি কাক একত্র হলেই বাধে বিপত্তি। ডিম ফেলে নিজেদের মাঝে শুরু হয় বোঝাপড়া। কোনো কাক ডিম খেতে থাকলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে ডিম পাড়া হাঁসটি। কিছুই করার থাকে না ওর।

কেডি বয় সজল। ক্যাম্পস্টুল বিছিয়ে বসে আছে ছাতার মতো দেবদারু গাছের নিচে। সজলের স্যার সবেমাত্র স্কোয়াশ রুমে ঢুকেছে, ফিরতে বেশ দেরি হবে। হঠাৎ সজলের চোখ গিয়ে পড়ে লেকের পাড়ে একটি কাকের দিকে। একটি ডিম ঠোকর দিচ্ছে কাকটি। ডিমটি আকারে একটু ছোটো। ঠোঁটে করে উপরে তুলছে আবার ফেলছে। আশ্চর্য! অবিরাম ঠোকর দেয়ার পরও ফাটছে না ডিমটি!

উঠে দাঁড়ায় সজল। লেকের দিকে এগিয়ে আসে। সজলকে এগোতে দেখেই সতর্ক হয় কাকটি। ঠোঁট বড়ো করে ধরে রাখে ডিমটি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয় সজলকে।

থেমে যায় সজল। আর একটু কাছে গেলেই মুখের ডিমটি নিয়ে উড়াল দিবে। খুব হাসি পায় সজলের। মুখের ডিমটি নিচে রাখলে দুই হাতে তালি দেয় সে। ওটা রেখেই উড়াল দেয় কাকটি। আসলে ওটা ডিম নয়, গতকালের কেনা নতুন একটি বল। বোকা কাকটি ডিম ভেবে ঠুকিয়েই যাচ্ছিল।

কাছে গিয়ে বলটি তুলে নেয় সজল। বোকা কাকটিকে তিরস্কার করতে থাকে, আসল নকল না বোঝার জন্য। আসল নকল না বুঝলে অনেক পরিশ্রমও ব্যর্থ হয়। কিছু ধাতুর রং সোনার মতো হলেও সোনা নয়। অনেক বন্ধুও তেমনি হয়। সুন্দর চেহারার হলেও সবাই ভালো মনের নাও হতে পারে, চিনতে হবে নিজেকেই। ■

লেখক: গল্পকার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

স্মৃতিকথা

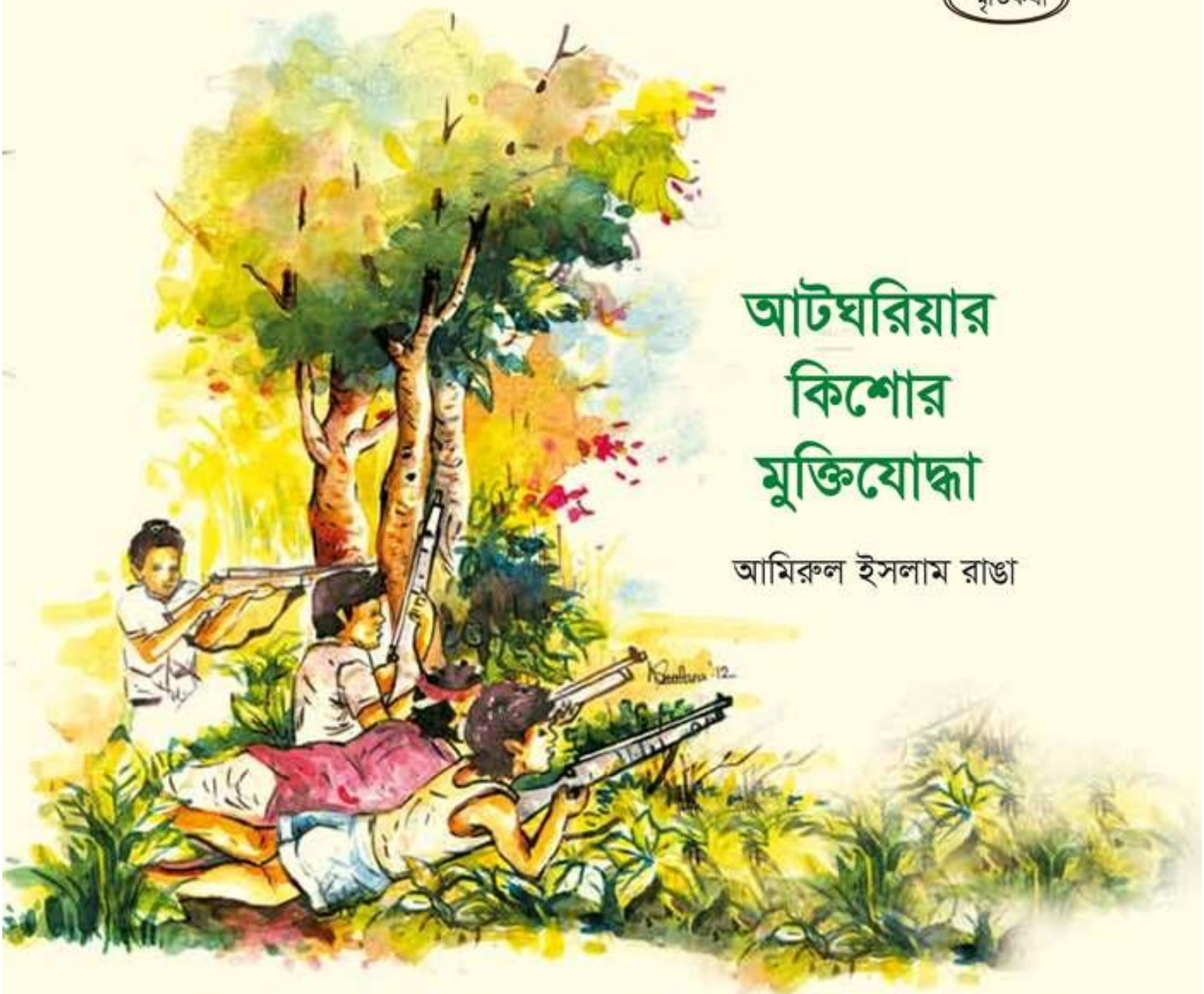

আটঘরিয়ার কিশোর মুক্তিযোদ্ধা

আমিরুল ইসলাম রাঙা

উনিশ'শ একাত্তর সালে আটঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী। সবার কাছে মুহাম্মদ নামে পরিচিত। বয়স তেরো অতিক্রম করলেও চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয়নি। এমন সময় দেশে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ২৫শে মার্চ কালরাত থেকে শুরু হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করছে পাকিস্তানিরা। মানুষ হত্যা, মা-বোনের সম্ভ্রমহানি আর সাধারণ মানুষের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন অবস্থায় কিশোর মুহাম্মদ আলীর মনে শুরু হয় দ্রোহ। বিক্ষুব্ধ মনে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। গোপনীয়তা রক্ষা করে তার কয়েকজন সহপাঠী এবং বন্ধুর সাথে পরামর্শ করেন। কয়েকজন এমন সিদ্ধান্তে সাড়া দেন। বাবা-মার একমাত্র পুত্র মুহাম্মদ আলী তার বাবাকে বলে সে ভারতে যেতে চায়। দেশে থাকলে পানিকস্তানি সৈন্যরা মেরে ফেলতে পারে বরং পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিলে জীবনটা রক্ষা পাবে। তার এমন কথায় বাবা-মা সম্মত হন।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এরপর শুরু হয় কিশোর মুহাম্মদ আলীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার গল্প। আটঘরিয়ার মানুষ মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলীকে চেনেন। তবে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার গল্প খুব কম মানুষই জানেন। কেমন করে কিশোর মুহাম্মদ আলী ভারতে গেলেন, কেমন করে মুক্তিযোদ্ধা হলেন, কোথায় কোথায় যুদ্ধ করলেন- সেসব কথা জানলে পাঠক বিস্মিত ও শিহরিত হবেন। তাকে নিয়ে বলা এইসব গল্পের মধ্যে আছে চমকপ্রদ ইতিহাস

মে মাসের শেষে কোনো একদিন কিশোর মুহাম্মদ আলী ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। সাথে তার সহপাঠী বাল্যবন্ধু আটঘরিয়া পৌরসভার উত্তর চক গ্রামের কালাম এবং বিরুলিয়া গ্রামের খোয়াজ উদ্দিন। দলের আরেক সদস্য পাবনা সদর উপজেলার গাঁতি গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস। সবার মধ্যে কুদ্দুস বড়ো। সে আটঘরিয়ার দেবোত্তরে লজিং থেকে পড়াশুনা করত। তখন সে নবম শ্রেণিতে পড়ত। সবার কাছে যৎসামান্য টাকাপয়সা থাকলেও মুহাম্মদ আলী নিয়েছিলেন মায়ের ব্যবহৃত অল্প পরিমাণ সোনা এবং রূপার অলংকার। সাথে টাকাপয়সা যতটুকু ছিল তার থেকে বেশি ছিল মনোবল। অদম্য মনোবল নিয়ে ৪ জন রওয়ানা দিয়ে ২ দিন পর ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি গিয়ে পৌছান।

জলঙ্গি থেকে নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা ট্রানজিট ক্যাম্পে উপস্থিত হন। চুয়াডাঙ্গা ট্রানজিট ক্যাম্পটি ছিল পাবনা জেলার জন্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রিকরুট করার অন্যতম ক্যাম্প। সেখানে মুহাম্মদ আলীসহ ৪ জন উপস্থিত হলে অনেকে তাদের নিরুৎসাহিত করে। এত ছোটো বয়সি ছেলেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রিকরুট করার সম্ভাবনা কম। এছাড়া ক্যাম্পে থাকা এবং খাবারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাদের সাথে যাওয়া আবুল কালাম এবং খোয়াজ উদ্দিন কয়েক দিন পর দেশে ফিরে যান। তখন সেখান থেকে যান মুহাম্মদ আলী এবং আব্দুল কুদ্দুস। বেশ কয়েক দিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এ পাঠানোর জন্য একটি দল বাছাই করার সময় আব্দুল কুদ্দুস সিলেক্ট হন। কিন্তু মুহাম্মদ আলী কম বয়স হওয়ার কারণে বাদ পড়ে। মুহাম্মদ আলীর শত অনুরোধেও সিলেকশন বোর্ডের মন গলাতে পারে না। সিলেকশন বোর্ডের জনৈক সদস্য মুহাম্মদ আলীকে দেখে বলেছিল, তোমার থেকে অস্ত্রের ওজন বেশি। তুমি মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য উপযুক্ত হও নাই। যাই হোক মুহাম্মদ আলী বাদ পড়লেন আর আব্দুল কুদ্দুস ট্রেনিং -এ চলে গেলেন। মুক্তি পাগল মুহাম্মদ আলীর যে মুক্তিযোদ্ধা হতেই হবে। সে কিছুতেই ব্যর্থ হতে রাজি না। প্রয়োজনে বছরের পর বছর সে অপেক্ষা করবে। তবুও সে মুক্তিযোদ্ধা হবে। ক্যাম্পে দায়িত্বরত বিভিন্ন জনকে সে ধরপাকড় শুরু করল। কাকুতি মিনতি আর অনুরোধে কারোর মন গলাতে পারছে না। এক পর্যায়ে রিকরুটের সাথে জড়িত পাবনা পুলিশ লাইনের আর আই আবুল খায়ের তাকে আশ্বাস দিলেন, তুমি এক মাস অপেক্ষা করো। পরের ব্যাচে তোমাকে নেওয়া হবে। যথারীতি এক মাস পরের ব্যাচে মুহাম্মদ আলীকে সিলেক্ট করা হলো। বন্ধু আব্দুল কুদ্দুস ট্রেনিং শেষ করে চলে আসেন। আর মুহাম্মদ আলী ট্রেনিং-এর জন্য রওয়ানা হন।

দার্জিলিং জেলার পানিঘাটায় মুহাম্মদ আলীর ট্রেনিং শুরু হয়। প্রায় মাসব্যাপী ট্রেনিং সফলভাবে শেষ করে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তরঙ্গপুর ৭ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যোগ দেন। তার মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অভিষেক হয়। এরপর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে একাধিক যুদ্ধে অংশ নেন। উল্লেখ্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্ত এলাকায় ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ নেন এবং মুহাম্মদ আলী সেখানে এক যুদ্ধে আহত হন। সীমান্ত এলাকায় কয়েক মাস কাটিয়ে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে নিজ জেলা পাবনায় প্রবেশের সুযোগ পান।

চাটমোহর উপজেলার নরাইখালী গ্রামের এম আই চৌধুরীর নেতৃত্বে ১১ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আটঘরিয়া ও চাটমোহর উপজেলায় প্রবেশ করে। সেই দলে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দলটি আটঘরিয়া উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে অবস্থান গ্রহণ করার পর একটি দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। দলে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বিগোস্বামী, অজিত এবং গোবিন্দ ছুটি নিয়ে তাদের পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য চাটমোহর গুনাইগাছা এলাকায় যাবার কথা বলে বের হবার পর তিনজনই নিখোঁজ হন।

এরপর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম আই চৌধুরী তার দলের ভারতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আট জনের সাথে স্থানীয় প্রায় ৩০-৪০ জন তরুণ ও যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দলভুক্ত করে। তারা চাটমোহর উপজেলার কামালপুর গ্রামের রাজাকার বাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে প্রায় ৮/১০ জনকে হত্যা করে এবং তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে নেয়। বামন গ্রামে সেনাবাহিনীকে বহনকারী ট্রেনে আক্রমণ করে। ১২ই ডিসেম্বর আটঘরিয়া থানা ভবন এবং ১৪ ই ডিসেম্বর চাটমোহর থানা আক্রমণ করেন। ১৬ ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও চাটমোহর থানা মুক্ত হয় ২০শে ডিসেম্বর।

এরপর আটঘরিয়ার কিশোর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী নিজ উপজেলায় ফিরে আসেন এবং আটঘরিয়া থানা ভবনে অবস্থানরত এফ এফ কমান্ডার মোস্তাজ আলীর দলের সাথে যোগ দেন এবং ২০শে ডিসেম্বর থেকে ২৯ শে জানুয়ারি পর্যন্ত আটঘরিয়া থানা ভবনে অবস্থান করেন। এরপর এক গ্রুপ পাবনা বিসিকে এবং আরেক গ্রুপ ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। ■

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য, আটঘরিয়া প্রেস ক্লাব

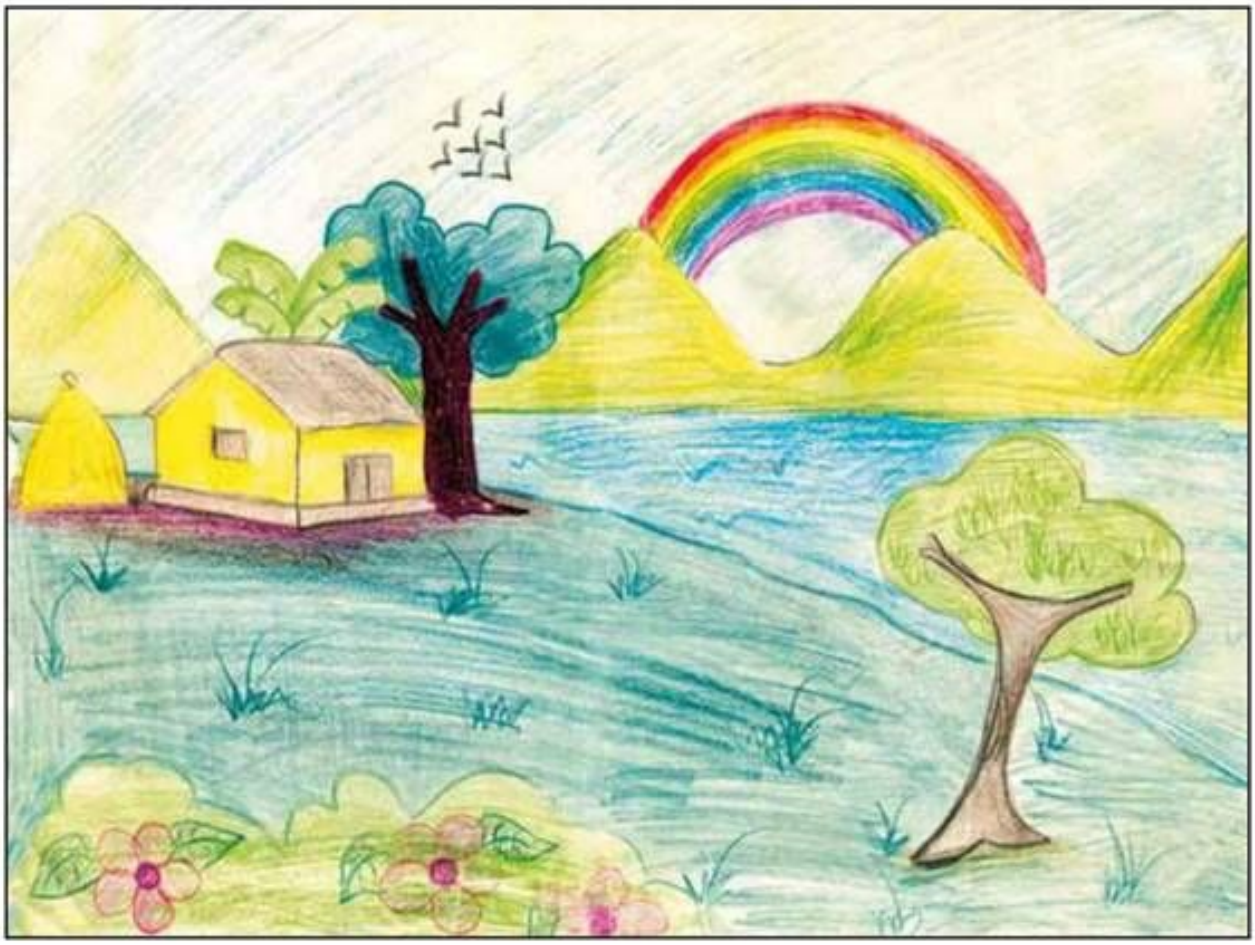

ইরিনা হক, ৫ম শ্রেণি, ইএসএস স্কুল, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রহস্যময় শব্দ

শামীমা নাসরিন

আশ্চর্য মহাকাশ! অনন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে কত অজানা ঘটনা। যা সবসময় জানা বা বোঝা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। তবে মাঝেমধ্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দেওয়া নানা তথ্য এই অজানা ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের জানতে সহায়তা করে।

সম্প্রতি এই সুবিশাল মহাকাশ সম্পর্কে অজানা তথ্য এবং চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো একটি দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন নাসার মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের টুইটারে শেয়ার করা ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, মহাকাশের অন্ধকার মেঘমুক্ত আকাশের অসংখ্য তারার সমাবেশ। আমাদের সৌরজগতের এই ছায়াপথে বা মিল্কিওয়েতে হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে ধরা পড়েছে মহাকাশের অদ্ভুত এক শব্দ। যাকে জ্যোতির্বিদরা সোনিফিকেশন বলে বর্ণনা করেছেন।

টেলিস্কোপ ব্যবহারকারীরা প্রায় ৪০০ আলোকবর্ষ জুড়ে ওই অঞ্চল থেকে নক্ষত্রদের ডেটা বা আওয়াজ শুনতে পারেন। নাসার চন্দ্র এক্সরে অবজারভেটরি, হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এবং স্পিজিটর স্পেস টেলিস্কোপের 'একক' হিসেবে বা একসঙ্গে কাজ করে।

প্রতিটি চিত্র পৃথিবী থেকে প্রায় ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরের ওই অঞ্চলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ করে। হাবলের চিত্রটি শক্তিশালী অঞ্চলগুলোর রূপরেখা তৈরি করে যেখানে নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে, অন্যদিকে স্পিটজারের ইনফ্রারেড চিত্রটিতে জটিল কাঠামোযুক্ত ধূলিকণা মেঘ দেখায়। আর এই হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে মিল্কিওয়ের ডেটা সংগ্রহ করার পর নাসার মহাকাশ বিজ্ঞানীরা টুইটারে একটি অডিও পোস্ট করেছেন।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মহাশূন্যে রহস্যময় হৃদকম্পনের শব্দ

মহাকাশে বাতাস নেই। বাতাস না থাকার কারণে সেখানে শব্দও নেই। তোমরা জেনে অবাক হবে প্রাণপণে চিৎকার করলেও তোমার থেকে ১ ফুট দূরে থাকা মানুষও সেই শব্দ শুনতে পাবে না। যদিও মহাশূন্যে বেশ তরঙ্গ ভেসে বেড়ায়, যাকে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ তরঙ্গে পরিবর্তন করে শুনতে পান বিজ্ঞানী ও মহাকাশচারীরা। এবার এমনই একটি যন্ত্রে মহাকাশ থেকে ভেসে আসা এক রহস্যময় শব্দ ধরা পড়েছে। যা শুনতে হুবহু হৃদযন্ত্রের মতো। আর এই শব্দ শুনে আশ্চর্য হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

জানা যাচ্ছে, পৃথিবীর থেকে ১৫ হাজার আলোকবর্ষ দূর থেকে এই শব্দ ভেসে আসছে। একটি গ্যাসের মেঘের কাছাকাছি এই শব্দের উৎস। জানা যায় শব্দটি গামা তরঙ্গ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ভেবে পাচ্ছেন না এই শব্দ কোথা থেকে শক্তি পাচ্ছে, এর সঠিক উৎসই বা কী। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখো, এক বছরে আলো যতদূর যেতে পারে তাকে এক আলোকবর্ষ বলে।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই গ্যাসের মেঘটির ঠিক মধ্যখান থেকে ভেসে আসছে রহস্যময় হৃদকম্পন এর শব্দটি। অনেকেই মনে করছেন ব্ল্যাক হোলের পাশে প্রোটনের কারণেই এই শব্দ তৈরি হচ্ছে এবং মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। যদিও এখনো কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি কেউ।

এছাড়াও গত বছরের ২৮শে এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে যে, আকাশের একটি মৃত নক্ষত্র থেকে ধারাবাহিকভাবে সংকেত আসছে। এগুলো খুব শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গ, যা সেকেন্ডের হাজারতম হিসাবে শোনা যায়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই রেডিও সংকেতগুলো বড়ো রহস্যের জট খুলতে পারে।

২৮শে এপ্রিল, আমাদের থেকে ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে একটি মৃত তারার কিছু আলোড়ন রেকর্ড করা গিয়েছিল। এটি এমন একটি উজ্জ্বল এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও তরঙ্গ, যা পৃথিবী থেকেও স্পষ্ট ছিল। এটি গ্লোবাল এবং স্পেসের এক্স-রে তেও ধরা পড়েছে। কোনো নক্ষত্র থেকে শোনা এটি এই জাতীয় ধরনের প্রথম শব্দ। কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে এটি দ্রুত রেডিও ফাটানো (এফআরবি) সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করবে। প্রসঙ্গত, এর আগে যে সংকেতগুলো পাওয়া গেছে, তারা অন্য একটি ছায়াপথ থেকে আসত, তবে আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি তারা থেকেই এই নতুন সংকেত আসছে।

কোনো কোনো গবেষকের মতে, এই ভয়েস এবং লাইটগুলো সুপারনোভা থেকে এলিয়েনের সংকেত হতে পারে। একই সাথে কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, এটি একটি বিশেষ ধরনের নক্ষত্রের ইঙ্গিত যাকে ম্যাগনেটারস বলে। এরা এমন তারা, যাদের চৌম্বকীয় শক্তি পৃথিবীর চেয়ে ট্রিলিয়ন এবং ট্রিলিয়ন কোটি বেশি শক্তিশালী। অর্থাৎ যদি এই উৎসটি চাঁদের দূরত্বের কাছে পড়ে যায় তবে বসে থাকার সময় এটি আপনার পকেট থেকে আপনার চাবিটি টানবে, অর্থাৎ পৃথিবী পুরোপুরি ধসে পড়বে।

পর্বত থেকে ভেসে আসা রহস্যময় শব্দ

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ গুইঝৌর জিউওই পর্বতের ছবি এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। রহস্যময় গর্জন শুনে হাজার হাজার লোক যে পর্বতে উঠছে, তা ধরা পড়েছে অনেক ছবিতে। জিউওই পর্বতে এত লোক যাতে না ওঠে, সেজন্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু জনস্রোতে টেকেনি সেই অবরোধ। বাধ্য হয়েই লোকজনকে আশ্বস্ত করতে ওই পর্বতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রশাসন।

গত ২০শে জুন স্থানীয় কয়েকজন চাষি দাবি করে, তারা পর্বত থেকে আসা অদ্ভুত এক আওয়াজ শুনেছে। আশপাশে সে খবর ছড়িয়ে পড়ে। তার পরেই জিউওইয়ের একাধিক গ্রামের লোকজন পর্বতে চড়ছে ঝাঁক বেধে। অতি উৎসাহীরা সেই ছবি মোবাইল ক্যামেরায় ধারণও করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট হওয়ার পর তা নিয়েও আলোচনা তুঙ্গে। কেউ বলছে নির্ঘাত বাঘের গর্জন,

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

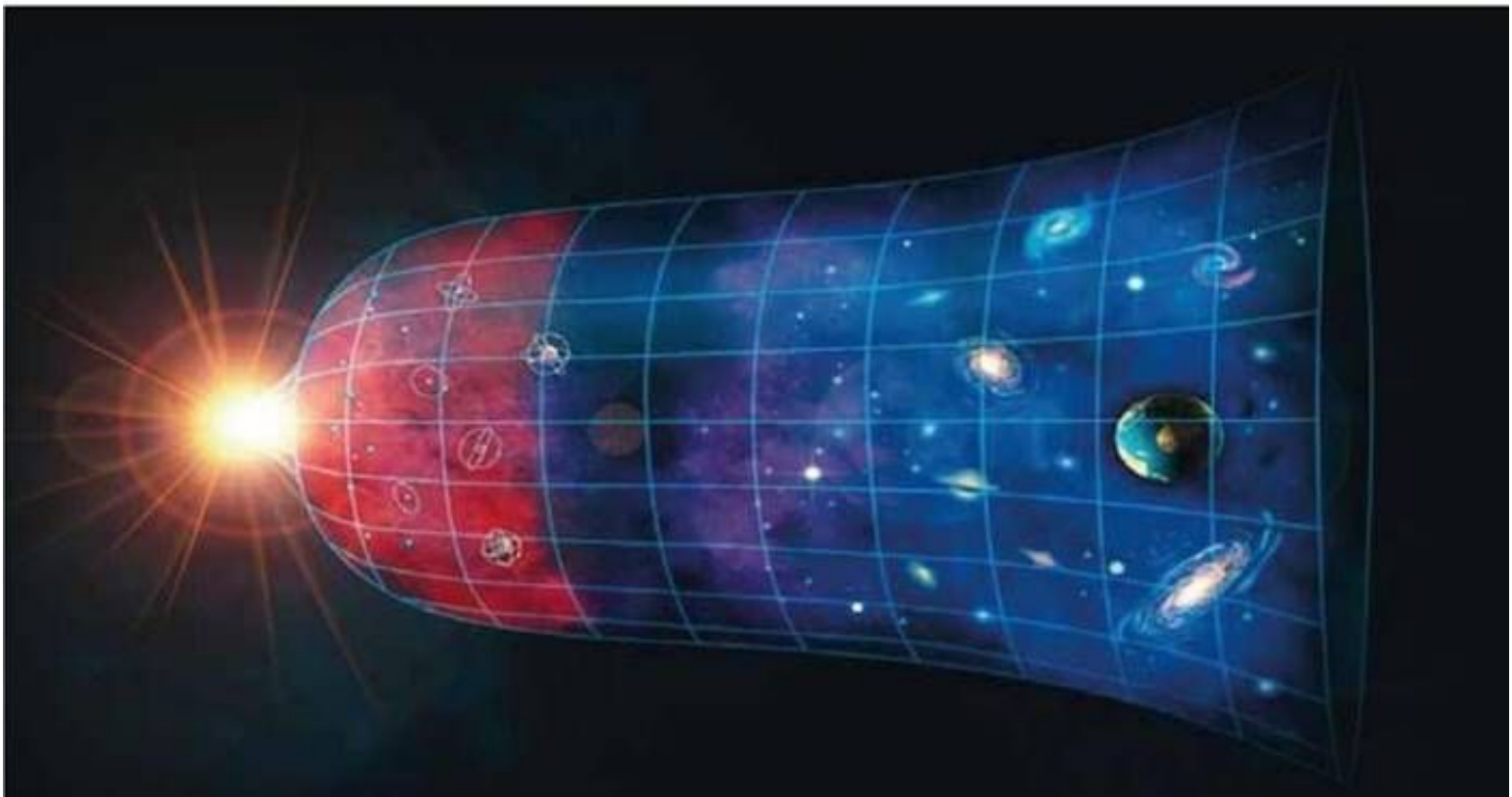

কেউ বলছে ড্রাগন। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ওই পর্বতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠাচ্ছে গুইঝৌ প্রশাসন।

দূর মহাকাশে রহস্যময় 'বিকট' শব্দ!

দূর মহাকাশ থেকে ভেসে আসা সংক্ষিপ্ত একটি শব্দ উদ্ধার করেছেন জ্যোতির্বিদরা। তরঙ্গ আকারে আসা রহস্যময় 'বিকট' শব্দটি ধরা পড়েছে শক্তিশালী রেডিওতে। তবে এমন শব্দ বেশ কয়েকবার পাওয়ায় মহাকাশে ভিনগ্রহী বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সম্ভাবনা জোরালো বলে দাবি গবেষকদের।

জানা গেছে, রেডিওতে ধরা পড়া শব্দটি মাত্র ১০ মিলি সেকেন্ডের। শব্দটি হয়েছে কয়েকবার। এর উৎস দূর মহাকাশ হলেও উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে নিশ্চিত নন জ্যোতির্বিদরা। এর আগে গবেষকরা মনে করতেন, দূর মহাকাশ থেকে আসার শব্দ বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। তবে এবার বোঝা যাচ্ছে, কিছু উৎস থেকে কয়েকবার করে শব্দ পাঠানো হয়েছে। গবেষকরা মনে করেন, দূর মহাকাশ থেকে রহস্যময় কোনো ঘটনার কারণেই শব্দগুলো সৃষ্টি হয়েছে। আর কিছু শব্দের উৎসে বুদ্ধিমান ভিনগ্রহী প্রাণীও থাকতে পারে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, দূর মহাকাশ থেকে আসা কিছু সংকেত নির্দিষ্ট ধরনের হয়। এই শব্দগুলো বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর সৃষ্টিও হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষক জেমস কর্ডেসের মতে, শব্দের উৎস নির্বাচন বেশ ঝামেলার। তবে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে দূর মহাকাশ থেকে। এর মানে হলো উৎসের শব্দটি বেশ বড়ো। আগে মনে করা হতো অপর কোনো গ্যালাক্সি নিউট্রন নক্ষত্রের সংঘর্ষে শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। তবে নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে শব্দের উৎস ধ্বংস হয়নি। কিছুদিন পরপরই শব্দ হচ্ছে।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর গবেষক শামী চ্যাটার্জি বলেন, ভিন্ন কোনো ঘটনার কারণেও একই শব্দ দু-বার আসতে পারে। তবে ভিনগ্রহী বিষয়টিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

বারবি ডলের অজানা কথা

এম আতিকুল ইসলাম

বন্ধুরা, তোমাদের অনেকেরই প্রিয় পুতুল বারবি ডল। দেখতে অত্যন্ত আদুরে পুতুলটি সারা বিশ্বেই সমান জনপ্রিয়। আজ জানব এ পুতুলের ইতিহাস । সময়টা হলো ১৯৫০ সাল। মার্কিন নাগরিক রুথ হ্যান্ডলার লক্ষ্য করলেন তার কন্যা বারবারা হ্যান্ডলার ও তার বন্ধুরা সাধারণ ছোটো পুতুলের চেয়ে পূর্ণবয়স্ক পুতুল নিয়ে খেলতেই বেশি আগ্রহী। রুথের মনে হলো ছোটো মেয়েরা বেবি পুতুলের যত্ন নেওয়ার চাইতে পুতুলের মাঝে নিজেদের 'বেড়ে উঠার ইমেজ' আবিষ্কারেই বেশি আগ্রহী। রুথ চাইলেন থ্রি ডাইমেনসনাল বা ত্রিমাত্রিক পুতুল বানিয়ে মেয়ের কল্পনাকে বাস্তবে রুপ দিতে। তিনি তার পরিকল্পনার কথা স্বামীকে জানালেন। তার স্বামী এলিয়ট হ্যান্ডলার ছিলেন মেটাল করপোরেশনের মালিক। তিনি করপোরেশন কমিটির সভা ডাকলেন। উদ্দেশ্য এ ধরনের কোনো পুতুল বানানো যায় কিনা; কিন্তু কমিটির সদস্যরা অধিক খরচের অজুহাতে রাজি হলেন না। কিছুদিন পর রুথ ইউরোপ থেকে ফেরার পথে সাথে করে নিয়ে এলেন 'লিলি' নামের এক পুতুল,যা বানানো হয় জার্মানিতে, এক জনপ্রিয় কমিক চরিত্রের আদলে। লিলিকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন রুথ। একজন ডিজাইনার নিয়োগ দিলেন এরকম একটা পুতুল তৈরির জন্য। অবশেষে তৈরি হয়ে যাওয়ার পর মেয়ে বারবারার নামানুসারে এই পুতুলের নাম দিলেন 'বারবি ডল'।

১৯৫৯ সালে নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত 'আমেরিকান টয় ফেয়ার'-এ প্রথমবারের মতো আত্মপ্রকাশ করল বারবি। প্রথমবারেই বিক্রি হলো তিন লাখ একান্ন হাজার পুতুল। ছোটো-বড়ো সকলের কাছেই রয়েছে এর কদর। সাড়ে ১১ ইঞ্চি দীর্ঘ, সুন্দর লম্বা পা,উজ্জ্বল বাদামি চোখের বারবি ডলের চুলের ডিজাইন এবং মুগ্ধ করা উজ্জ্বল পোশাক সবার মন কেড়ে নেয় সহজেই। বারবি পুতুল বিভিন্ন পেশার মেয়েদের অবয়বে তৈরি হয়ে বাজারে আসে। যেমন- টিভি নিউজ কাস্টার, হলিউডের নামিদামি অভিনেত্রীদের আদলে, নার্স, চিকিৎসক, মহাকাশযাত্রী, দমকল কর্মী, বিদ্যালয় পড়ুয়া বালিকা, এমনকি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবেও অবতীর্ণ হচ্ছে এই ডল! তবে এর চোখের রং এবং আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না ।▪

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ছোটোদের গল্প

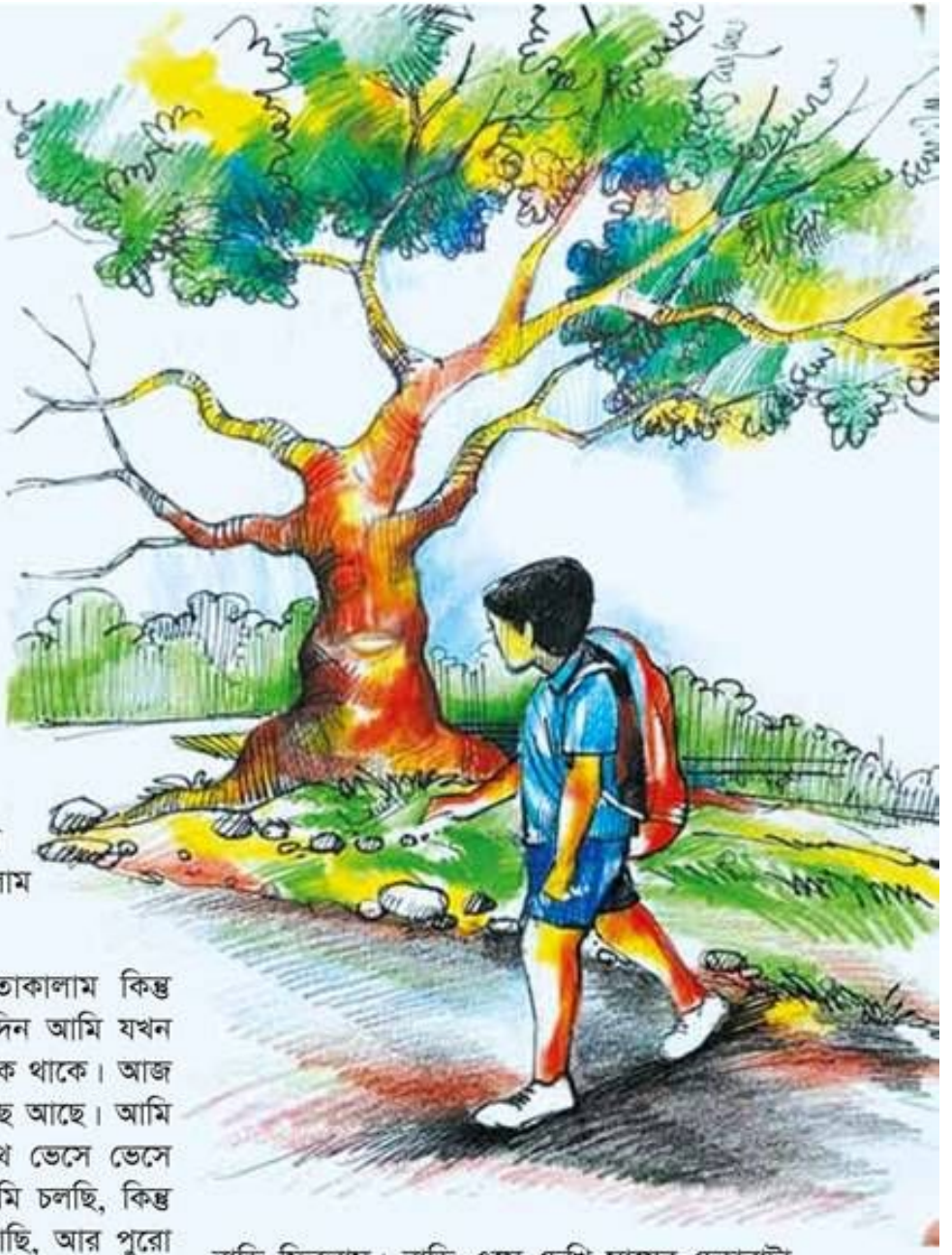

আজব গাছ

নবনিল আহমেদ

একদিন আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম। প্রতিদিনই আমি এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাই। কিন্তু আজ কেন জানি আমার রাস্তা দিয়ে যেতে একটা আজব রকম অনুভূতি হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে আমার ব্যাগ কেউ ধরে রেখেছে। আমি হাঁটছিলাম ঠিকই কিন্তু আমি এগোচ্ছিলাম না।

আর তখনই আমি আশেপাশে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। প্রতিদিন আমি যখন স্কুলে যাই তখন রাস্তায় অনেক লোক থাকে। আজ নেই। কিন্তু আমার পাশে একটা গাছ আছে। আমি হাঁটছি, গাছটাও আমার সাথে সাথে ভেসে ভেসে চলছে। আমি নিচে তাকালাম। আমি চলছি, কিন্তু আমি লক্ষ করলাম, আমি ভেসে আছি, আর পুরো রাস্তাটা পেছনে এগোচ্ছে।

এভাবেই আমি স্কুলে পৌঁছে গেলাম। ভালোভাবে ক্লাস করলাম। বন্ধুদের সাথে কথা বললাম। কিন্তু কাউকে এই ঘটনার কথা বললাম না। কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না। টিফিন টাইমে খেললাম। বাকি দুটো পিরিয়ডও করলাম। টিং টিং টিং ঘণ্টা বাজল। ছুটি হলো। এবার বাসায় যাবার পালা।

আমি আবার সেই রাস্তা দিয়েই বাসায় যাচ্ছি। ভর দুপুরে আমি একা একাই বাসায় যাই। আমার ভয় লাগে না। রাস্তায় মানুষ আছে এক-দুই জন। তাও অনেক সামনে। হঠাৎ আমি কিছুর সাথে ধাক্কা খেলাম। আহ্ ভীষণ ব্যথা। মনে হলো একটা গাছের সাথে ধাক্কাটা খেয়েছি। এই ব্যথা নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি এসে দেখি মায়ের চেহারাটা পালটে গেছে। কেমন যেন অদ্ভুত। নাকটা অনেক লম্বা আর চোখা। সামনের দাঁত দুটো চোখা আর বড়ো বড়ো। চোখের মনিটা খুব ছোটো আর তিনকোনা। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। মা আমার ওপর খুব রেগে আছেন। বাবা অফিসে। ভাইয়া তো আমার গলা টিপে ধরে রেখেছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি শ্বাসও নিতে পারছি না। এটা কি সেই গাছের জন্য!

হঠাৎ আমি জেগে গেলাম। জেগে দেখি আমার গলার উপরে আমার বালিশ। আর তারও উপর আমার কোলবালিশটা। ঘুমের মধ্যে আমি যে কত আজব স্বপ্ন দেখি।■

লেখক: ৬ষ্ঠ শ্রেণি, রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নোটনের মন

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

আমার মেয়ে নামিরা হাসান ছোঁয়া। আমরা বাড়ির সবাই ওকে নোটন বলে ডাকি। নার্সারি, কেজি, ছাড়িয়ে সে এবার ক্লাস ওয়ানে উঠেছে। কিন্তু বছরের প্রথম দিকেই এবার কী এক অঘটন ঘটল! ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্‌বোধনী দিনেই দেশের সব স্কুলের মতো নোটনদের কিশলয় কালেক্টরেট স্কুলও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। এর কারণ হলো দেশব্যাপী এবং বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক। এই আতঙ্ক আমাদের মুন্সীগঞ্জ শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামগুলোতে প্রথম দিকে তেমন একটা আতঙ্ক না ছড়ালেও যখন দু-চারজন করে করোনায় আক্রান্ত হতে লাগল সবার মনেই টনক নড়ল, সবাই সচেতন হতে শুরু করল।

৭ বছরের মেয়ে নোটন প্রথমে বুঝতে পারছে না কেন স্কুল বন্ধ হয়ে গেল? সে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কি গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়া হয়েছে? বৈশাখ মাস তো এখনো আসেনি। আমি তখন বুঝিয়ে বললাম, করোনা ভাইরাস রোগের কারণে তোমাদের স্কুল বন্ধ দেওয়া হয়েছে।

নোটনের শিশু মনের প্রশ্ন, করোনা ভাইরাস কী?

আমি বললাম, এক ধরনের ভাইরাস বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে সারা পৃথিবীব্যাপী। এর নাম করোনা ভাইরাস। এটি মানুষের সংস্পর্শে এলেই তার সে রোগটি হয়। এই করোনা ভাইরাসের কারণে শরীরে জ্বর জ্বর ভাব হতে পারে, কখনো এ জ্বর বেড়ে যেতে পারে। শুষ্ক কাশি ও গলা ব্যথা হতে পারে। প্রথম দিকে এসব লক্ষণ দেখা দিলে তার করোনা পজিটিভ হয়েছে কিনা তা জানার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যদি এ রোগ হয়েই যায় তবে তাকে বাড়িতেই একটি আলাদা রুমে রাখতে হবে। হাসপাতালে অথবা বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে নিরাপদে থাকতে হবে। তার সঙ্গ নিরোধ করে পরিবারের অন্যদের থেকে আলাদা চলতে হবে। নতুবা পরিবারের অন্যদের মাঝেও এমনকি প্রতিবেশীদের মাঝেও এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

আমার কথা শুনে নোটন বলল,ওহ! কী ভয়াবহ এক রোগ!

শিশুতোষ বয়সে একবার বললেই তারা সে জিনিসটি মাথায় ঢুকিয়ে নিতে পারে। আমার মেয়ে নোটন ও তার ছোটো ভাই ৫ বছরের সৃজন পর্যন্ত আমার কথাগুলো মাথায় ঢুকিয়ে নিয়েছে। তারা দু'জন মোবাইল এর মাধ্যমে তাদের নানা-নানু, খালা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের পর্যন্ত করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছে। কীভাবে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় তা টিভি দেখে এবং আমার কাছ থেকে শুনে সব মনে করে

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রেখেছে। আমি একদিন নোটনকে বললাম, বলোতো কীভাবে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখব?

সে গড়গড়িয়ে বলতে লাগল, কিছুক্ষণ পর পর সাবান, হ্যান্ডওয়াশ বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে বিশ সেকেন্ড সময় ধরে হাত ধুতে হবে। হাত না ধুয়ে নাক, চোখ, মুখ স্পর্শ করা যাবে না। হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় হাত বা বাম হাতের কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচি দিতে হবে অথবা রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহার করা টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বিনে ফেলে দিতে হবে। পরিষ্কার জামাকাপড় পড়তে হবে। কাঁচা ফলমূল ভালো করে ধুয়ে খেতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম ভালো করে সিদ্ধ করে খেতে হবে। বেশি বেশি পানি পান করতে হবে, ফ্রিজের পানি পান করা যাবে না।

ও আরো বলতে চেয়েছিল। আমি হাত দিয়ে ইশারা করে বললাম, থাক তুমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছ। এগুলো মেনে চললেই হবে।

নোটন আবার বলতে চায়, মাস্ক পড়ে ঘর থেকে বের হতে হবে। আমি বললাম , এটা তো করোনা ছাড়াও সবার মাস্ক ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাইরে রাস্তাঘাটে দুর্গন্ধ ও যানবাহনের ধোঁয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য।

আমি পেশায় একজন সাংবাদিক। সবসময় খবর যোগার করতে বাইরে যেতে হয়। তবে করোনার কারণে খুব একটা বের হই না। বিশেষ প্রয়োজন হলেই সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে বের হতে হয়। আমি যখন বাড়িতে ঢুকি। তখন দরজার সামনেই দেখি আমার মেয়ে নোটন ও ছেলে সৃজন দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দিকে বুঝতে পারিনি কী জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পরে দেখি, একজনের হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার অন্যজনের হাতে সাবান ও পানি।

নোটন বলে, আগে হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাখো। মাখলাম। তারপর তার অর্ডার মতো কাঁধের ব্যাগের ওপরও কিছুটা মেখে দেই। এবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে মাস্কটি ফেলে দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকি। এভাবে চলতে থাকে। ভালো লাগে বড়োদের চেয়ে ছোটোরা অনেক জিনিস আগে বুঝে ফেলে।

কিন্তু ঘটনা হলো চার মাস পর। শিশুরা স্কুলে গিয়ে শুধু লেখাপড়াই শিখে না, বন্ধুদের সঙ্গে মিশে সামাজিকতাও শিখে। আমার মেয়ে নোটনও তাই করল। সে কেবল তার মাকে বলে, মা স্কুল কবে খুলবে? কবে আবার স্কুলে যেতে পারব? আর মনে মনে করোনা ভাইরাসকে বকে। কেন যে এই ভাইরাসটার সৃষ্টি হলো! তার জন্য স্কুলে যেতে পারছি না।

চারদিকে দেয়াল দেওয়া আমাদের বাড়ি। পাশের বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়ির একটি পকেট গেট ছিল। যা দিয়ে নোটন ও সৃজন পাশের বাসার আরিফা, আবদুল্লাহ ও ফাতেমার সঙ্গে খেলতে যেত। কিন্তু করোনার কারণে ওর মেজো ফুপি বলেছে, গেট তালা দিয়ে রাখতে। কারণ বলা তো যায় না এক শিশু হতে অন্য শিশুর মধ্যে মেলামেশার কারণেও ভাইরাস ঢুকে পড়তে পারে।

ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত বিনে ফেলা

চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা

করমর্দন থেকে বিরত থাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

জনবহুল স্থানসমূহ এড়িয়ে চলা

তাই গেট তালা দিয়ে রাখায় নোটনের মন খারাপ। সে বন্ধুদের সাথে খেলতে পারছে না। একদিন আমাকে বলে, বাবা আমাদের বাড়িটাকে একটা জেলখানা মনে হয়। আমি বললাম, কেন?

নোটন বলল, জেলখানাতে যেমন কয়েদিদের আটকে রাখা হয়। আমারও মনে হয় আমি বাড়িতে আটকে আছি।

আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, এই তো কিছু দিনের মধ্যেই এ ভাইরাস চলে যাবে। তখন তুমি আবার স্কুলে যেতে পারবে, সবার সাথে খেলতে পারবে।

কিন্তু বাবা এ ভাইরাসটা নাকি অনেক ভয়ংকর! পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে। নোটনের এ কথার জবাবে আমি বললাম, কে বলেছে এমন কথা?

টিভিতে দেখেছি। সংবাদ পাঠে একজন বলেছে। আমি আশ্বস্ত করে বলি, তোমাকে না বলেছি, ছোটোরা সংবাদ দেখে না। তোমরা দেখবে দুরন্ত চ্যানেলের কার্টুন ছবি। এভাবে চলতে থাকে মাস কয়েক।

প্রতি বছর রমজানের ঈদের পর নোটনরা তাদের নানা বাড়িতে বেড়াতে যায়। এবার যেতে পারেনি করোনার কারণে। কিন্তু কোরবানির ঈদের পর এবার তার আবদার হলো তাকে নানা বাড়ি নিয়ে যেতে হবেই। অনেক কিছু ভেবেচিন্তে আগস্ট মাসের শেষের দিকে নোটনদের নানাবাড়ি নিয়ে গেলাম। সিরাজদিখান উপজেলার উত্তর তাজপুর গ্রামে নোটনদের নানাবাড়ি। সে এলাকায় কোনো করোনা ভাইরাসের রোগী এখনও পাওয়া যায়নি। তাই সাহস করে নিয়ে গেছি। এরপর প্রায় মাস খানেক পরে ওদের আনতে আমি আবার উত্তর তাজপুর গ্রামে যাই। কেমন বেড়ানো হলো, জিজ্ঞেস করতেই নোটন বলল, আমি এখান থেকে যাব না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি চলে আসব। মাত্র ১ ঘণ্টার পথ। বিকেলের দিকে মুন্সীগঞ্জের পথে রওনা হবো। কিন্তু দুপুরে নোটনকে ভাত খাওয়ানো যাচ্ছে না। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নোটনের খালা বলল, তুমি কাঁদছ কেন? ভাত খাচ্ছ না কেন?

নোটন বলল, ভাত খাওয়া হলে যে বাড়ি চলে যেতে হবে। আমি বাড়ি যাব না। এখানেই থাকব।

আমাদের ঐ বাড়িটাকে জেলখানার মতো মনে হয়।

তখন খালা বুঝিয়ে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি মুন্সীগঞ্জ যেও না। এখানেই থেকো কিন্তু এখন ভাত খাও।

তারপর তাই ঠিক হলো। নোটনকে নানাবাড়ি রেখেই আমি আর ওর মা ছোটো ছেলে সৃজনকে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

গ্রামীণ পটভূমিতে মুক্ত বাতাসে উন্মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতেই শিশুরা বেশি পছন্দ করে। আমার নোটনকে দিয়েই তার প্রমাণ পেলাম। এরপর আরো

অসুস্থ বোধ করলে নিজেকে আলাদা করে রাখা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

১৫ দিন কেটে গেছে। কিন্তু নোটন আসতে চায় না। এবার আমি একটু রাগতস্বরেই ফোনে বললাম, তোমাদের স্কুল খুলে যাবে বলা হয়েছে। তাড়াতাড়ি চলে আসো। নোটন বলল, বাবা তুমি সত্য বলছ?

আমি বললাম, আমাদের বাড়িতে তো উঠান আছে। তোমার ছোটো ভাই আছে। পিকু ফুপির সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করতে পারো। আর ঢাকার কথা ভাবো। ঢাকার বাসাগুলোতে তো উঠান নেই। ওরা সেখানে বাসার ভেতরেই নানা রকম শৃজনশীল কাজ করছে একে অন্যের সাথে খেলাধুলা করছে এভাবেই সময় কাটাচ্ছে। কী আর করা। করোনা থেকে তো নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।

এ কথা বলার পরদিনই নোটন ওর নানার সঙ্গে আমাদের মুন্সীগঞ্জের বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু ৩রা অক্টোবরের পরও কোনো স্কুল খোলেনি। নোটন তাই আমাকে বলে, বাবা তুমি আমাকে ভুল কথা বলেছিলে? আমি ওকে কোনো উত্তর দিতে পারিনি।

তবে করোনার কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় অনেক শিশুরাই নানা সৃজনশীল কাজ করছে ঘরে বসে। এসময় প্রত্যেক বাবা মাকে তাদের সন্তানদের সময় দিতে হবে। তাদের সাথে ক্যারাম, লুডু, বাগডুলি ইত্যাদি খেলনা দিয়ে খেলে সময়টা পার করতে হবে। তবেই না আমরা নিরাপদে থাকব এবং করোনা থেকে সবাই ভালো থাকব। ■

লেখক: জেলা প্রতিনিধি বাংলাদেশ বেতার ও ছোটো গল্পকার

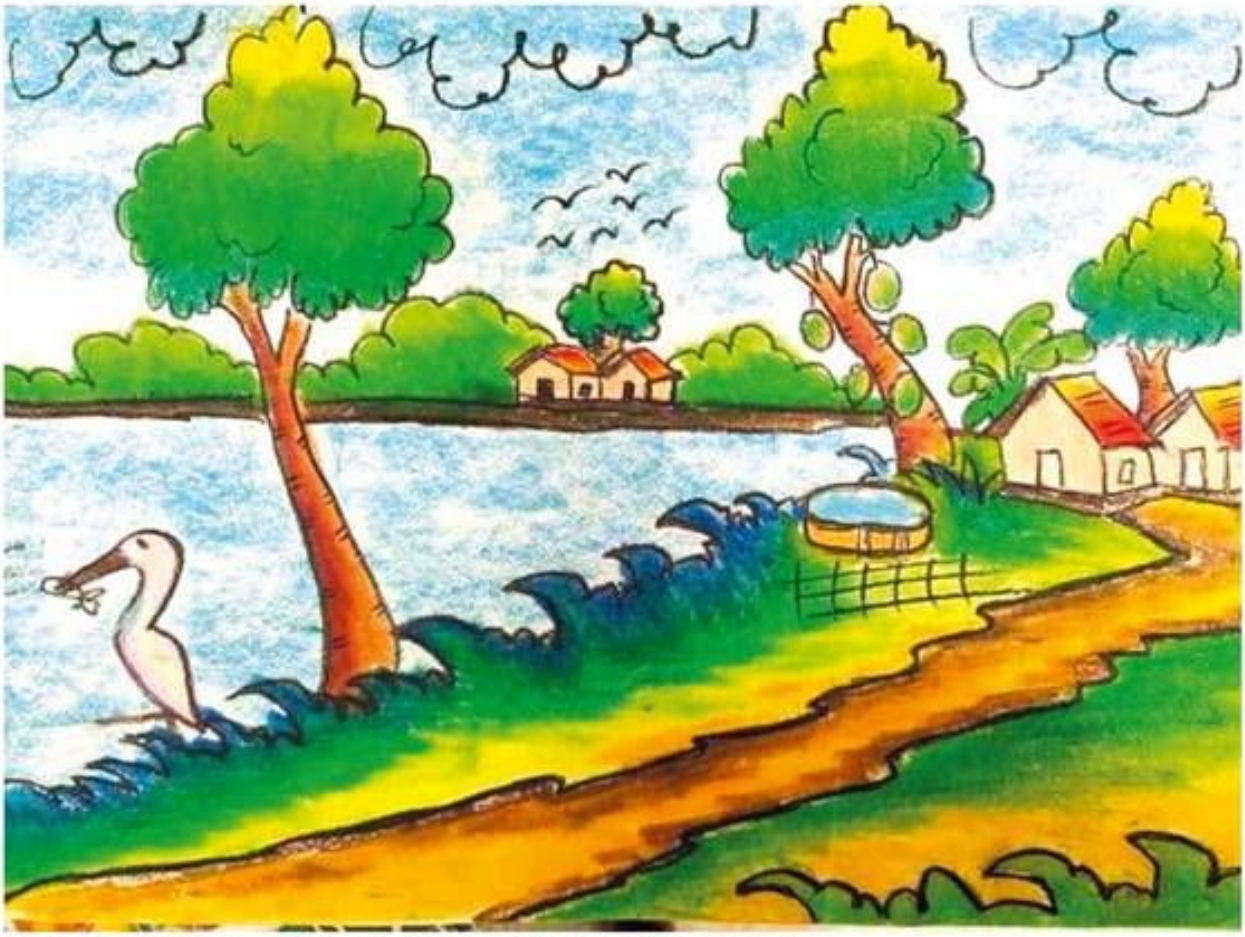

আয়ান হক ভূঁঞা, ১ম শ্রেণি , খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

করোনা প্রতিরোধে ফল

মো. জামালউদ্দিন

বন্ধুরা, করোনা মহামারির এই সময়ে ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধের প্রথম ধাপ হলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। যার ফলে শ্বাসযন্ত্র এবং ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে করোনা কালে সবচেয়ে কার্যকর হচ্ছে ভিটামিন-সি যুক্ত খাদ্য গ্রহণ। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, আমলকিতে পেয়ারার চেয়েও ১০ গুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে এবং কাগজি লেবুর চেয়ে ৩ গুণ ভিটামিন সি থাকে।

এছাড়াও আমলকিতে কমলার চেয়ে ১৫ থেকে ২০ গুণ বেশি, আপেলের চেয়ে ১২০ গুণ বেশি, আমের চেয়েও ২৪ গুণ এবং কলার চেয়ে ৬০ গুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে। একজন প্রাপ্ত বয়স্কের প্রতিদিন ৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি দরকার। এ পরিমাণ ভিটামিন সি দিনে মাত্র ২টি আমলকি খেলেই পূরণ করা সম্ভব।

করোনা থেকে বাঁচতে লেবু ও গরম পানি পানের বিকল্প নেই। ভিটামিন সি এর অভাব পূরণে লেবু হলো প্রথম ও প্রধান উৎস। এটি বাজারে সহজ লভ্য। করোনায় আক্রান্ত হলে এমনকি সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে এসময় লেবু খাওয়ার বিকল্প নেই। সকালে খালি পেটে লেবুর রস ও হালকা গরম পানি পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

ভিটামিন সি' জাতীয় অন্যান্য ফল যেমন আঙুর, পেয়ারা, আপেল, পেঁপে, শসা, কলা, তরমুজ এসবও নিয়ম করে খেতে হবে। সকালের নাশতায় একটি কলা ও আপেল বা পেয়ারা খাওয়া যেতে পারে।

দুপুরে ভাত খাওয়ার আগে কয়েক টুকরো পেঁপে বা তরমুজ খেতে পারো। আঙুর, পেঁপে, তরমুজ, কলা টুকরো করে সামান্য মধু মিশিয়ে ফ্রুট সালাদ করে খেলে শরীর অনেক পুষ্টি পাবে একসঙ্গে। সকাল বা বিকেলের নাশতার সময় ফ্রুট সালাদ খেতে পারো।

প্রতিদিন যদি ফল খেতে ভালো না লাগে; তাহলে টক দই মিশিয়ে স্যুপ বানিয়ে খেলে ভালো লাগবে। সব ধরনের ফলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি, ফোলেট, ডায়েটারিফাইবার, খনিজ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এসব পুষ্টি উপাদানসমূহে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার সক্ষমতা আছে।

রোগ প্রতিরোধ এমন একটি বিষয় যা রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে তোমার শরীরকে লড়াই করতে সহায়তা করে। সুতরাং জন্ম থেকেই আমাদের সবার শরীরেই থাকে এই ব্যবস্থা। তবে কারোও ক্ষেত্রে থাকে কম আর কারোও ক্ষেত্রে থাকে বেশি। তবে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় দেশীয় শাকসবজি, তাজা ফলমূল রাখতে হবে। কারণ এসবে আছে অনেক ভিটামিনও পুষ্টি উপাদান। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

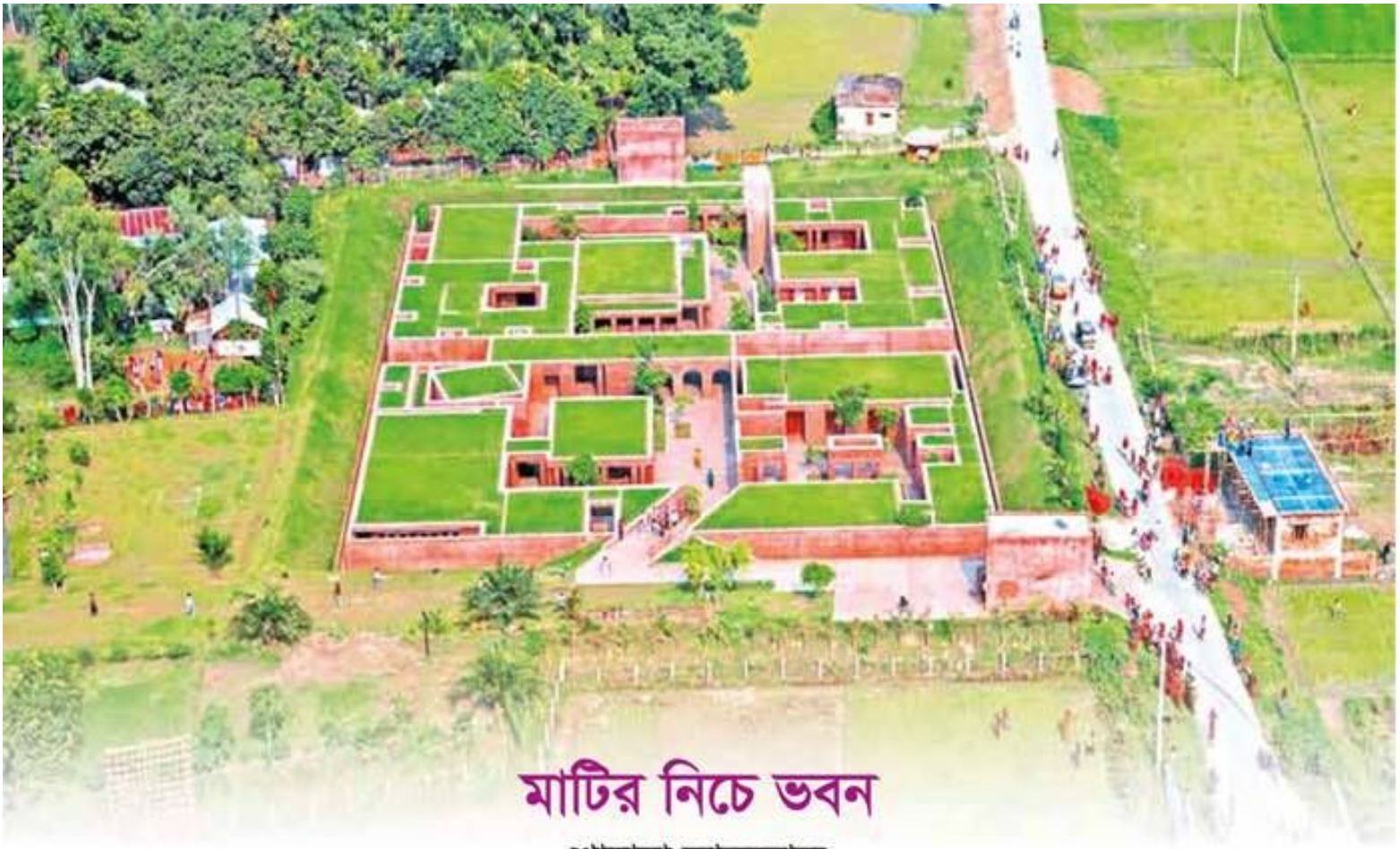

মাটির নিচে ভবন

শাহানা আফরোজ

গাইবান্ধা শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গাইবান্ধা-বালাসী সড়ক ঘেঁষে তারকাটায় ঘেরা একটি বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। এক পাশে বড়ো একটি ফটক। ফটক দিয়ে ঢুকলেই একাধিক ব্লকে বিভক্ত একটি ভবন। তাতে আছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লাইব্রেরি, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। একটির সঙ্গে আরেকটির সংযুক্ত বারান্দা ও খোলা প্যাভিলিয়ন । বিশাল ভবন কিন্তু পুরো ভবনটিই আমাদের চোখের আড়ালে। পাশ দিয়ে চলে গেছে গ্রাম্য সড়ক। অথচ সেখানে দাঁড়িয়ে ভবনটি চোখেই পড়বে না। কারণ, পুরো ভবনটি মাটির তলায়। গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের মদনেরপাড়া গ্রামের এই ভবনের দিকে সবাইকে অবাক হয়ে তাকাতেই হয়। প্রকৃতির মধ্যে মিশে যেন অদৃশ্য হয়ে আছে ভবনটি। এটি একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয়। সংস্থাটি চরের মানুষদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

সেন্টারটি স্থাপত্য শিল্পে এক অনবদ্য সৃষ্টি। যা শুধু গাইবান্ধা তথা আমাদের দেশকে নয় অবাক করেছে বিশ্বকেও।

সেন্টারটি সম্পূর্ণ মাটির নিচে ভবনের ছাদ ভূমি সমতলে। ভবনের ছাদে চার/ছয় ইঞ্চি পুরত্বের মাটির ওপর লাগানো হয়েছে নানা জাতের সবুজ ঘাস যা মিশে গেছে আশপাশের মাঠের সঙ্গে। ওপর দিক থেকে দেখলে মনে হয় মহাস্থানগড়ের প্রাচীন বৌদ্ধবিহার। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ভবনে যেতে হয়। অদৃশ্য এই ভবনে রয়েছে দুইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এর মধ্যে একটি শীতাতপ কেন্দ্র। কেন্দ্র দুইটিতে একসঙ্গে ২০০ জন প্রশিক্ষণ নিতে পারে। আবাসিক কক্ষ রয়েছে ২৪টি। আবাসিক কক্ষগুলোর মধ্যে শীতাতপ পাঁচটি। সবগুলো কক্ষে ৫০ জন লোক থাকতে পারবে। বিভিন্ন ব্লকে সাজানো প্রত্যেকটি কক্ষ । সামনে রয়েছে মিনি জলাশয়। জলাশয় থেকে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসে ব্যাঙের ডাক। মাঝে মাঝে রয়েছে বাঁশঝাড় । ছাদের ঘাস ভবনটিকে প্রকৃতির সাথে মিশে থাকতে সাহায্য করে। নিয়ন্ত্রণ করে তাপমাত্রা। মাটির নিচে হওয়ায় ভবনের কক্ষগুলো অনেকটা ঠান্ডা থাকে। বাইরের আলো-বাতাসও পাওয়া যায়। আলোছায়ার খেলা রয়েছে সেখানে। আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে বাড়ির একটি অবিচ্ছেদ্য

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

অংশ উঠান। এই ভবনে উঠানের অংশও রাখা হয়েছে। পানি নিষ্কাশনের জন্য রয়েছে পাঁচটি নর্দমা। সেন্টারে রয়েছে উন্নত খাবার ব্যবস্থা। এটি পরিবেশবান্ধব কার্যালয়।

২০১২ সালের ১৮ই নভেম্বর মদনেরপাড়া গ্রামে প্রায় আটবিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা এ প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। সেন্টারের ভবনের আয়তন ৩২ হাজার বর্গফুট। সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর। যারা আবাসিকে থাকবেন, তাদের জন্য রয়েছে অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার ব্যবস্থা ও বইপড়ার লাইব্রেরি। এখানে প্রতিদিন কেরাম, দাবা ও ব্যাডমিন্টন খেলা চলে। লাইব্রেরিতে আছে পাঁচ শতাধিক বই। সেন্টারে রয়েছে আধুনিক ইন্টারনেট সুবিধা এবং উন্নতমানের মিউজিক সিস্টেমের সুযোগ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। বিদ্যুৎ না থাকলে নিজস্ব জেনারেটরের ব্যবস্থাও রয়েছে। স্থানীয়ভাবে তৈরি ইটের গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত ভবনটি দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করে হাজারো দর্শনার্থী।

ভবন কর্তৃপক্ষ মনে করছে, মাটি ভরাট করে ভবন নির্মাণ করতে গেলে বাজেটের ৬০ শতাংশই শেষ হয়ে যেত। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান গ্রামে হওয়ার কারণে সেখানে দোতলা ভবন করলে গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে মিলত না। তাই সমতল ভূমির সঙ্গে মিল রেখে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে গ্রামের প্রকৃতির অংশ হয়ে উঠেছে ভবনটি।

আধুনিক ও চৌকস স্থাপত্য শৈলীর জন্য ইতোমধ্যেই এই ভবনের ঝুলিতে জমা হয়েছে নানা অ্যাওয়ার্ড। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সারা বিশ্বের সম্মানজনক আগা খান স্থাপত্য পুরস্কারের জন্য ভবনটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় মনোনয়ন পেয়েছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের (একেডিএন) পুরস্কারের জন্য বিশ্বের ৩৮৪টি স্থাপনাকে পেছনে ফেলে সেরা ১৯ স্থাপনার তালিকায় রয়েছে এই সেন্টার। সুন্দর স্থাপত্য নির্মাণের জন্য সেন্টারটি ২০১২ সালে 'এআরপ্লাসডি অ্যাওয়ার্ড' পায়। লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আর্কিটেক্স রিভিউ এই পুরস্কার দেয়। এটির স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী।■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

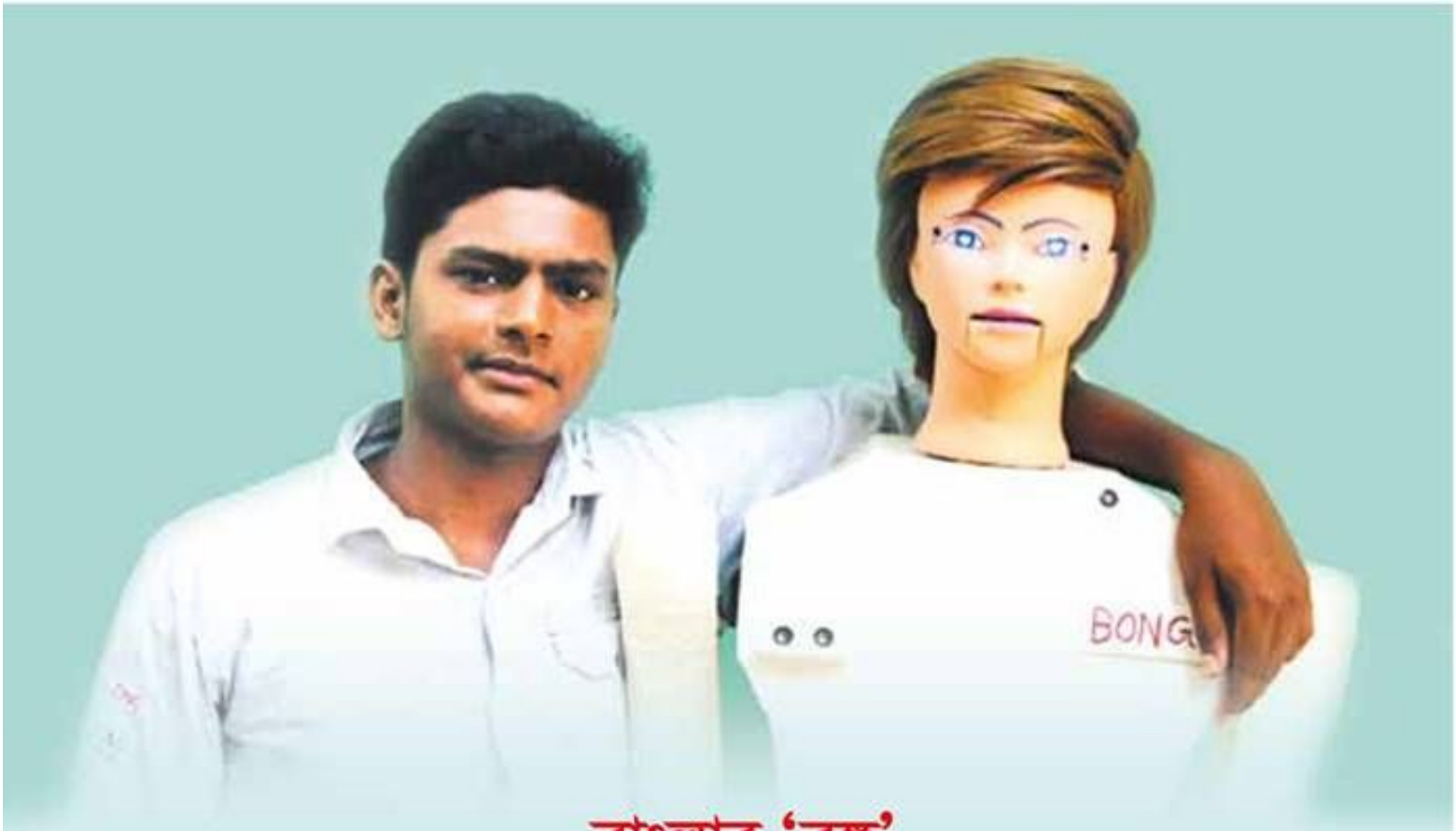

বাংলার 'বঙ্গ'

নাফি রাশেদুজ্জামান

মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করেন বাবা-মা। এটাই তাদের পারিবারিক পেশা। তবে মাটির এই মূর্তি তৈরিতে কোনো আগ্রহই নেই বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ছেলের। কারণ বাবা-মায়ের তৈরি মূর্তি তো আর কথা বলে না। তাই মাত্র দুই মাসের চেষ্টায় উদ্ভাবন করেছেন একটি কথা বলা রোবট। গল্পটি অগৈলঝাড়া উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের।

বিশ্বের প্রথম রোবট হিসেবে নাগরিকত্ব পেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা 'সোফিয়াকে' টেলিভিশনে দেখে অভিভূত হয়েছিল কিশোর সুজন পাল। এরপর রোবট বানানোর স্বপ্ন বাসা বাঁধে তার মনে। তখন বয়স মাত্র ১৩ বছর, ৮ম শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু স্বপ্নবাজ এই মেধাবী কিশোরের স্বপ্নপূরণে ছিল হাজারও বাঁধা। ছিল না রোবট তৈরির জন্য আধুনিক গবেষণাগার, ছিল না যন্ত্রাংশ । রোবট নিয়ে আগ্রহ থাকলেও এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞান ছিল না তার। ছিল না অর্থের জোগান। এ অবস্থায় দরিদ্র পরিবারের সুজনের রোবট তৈরির বিষয়টি ছিল অনেকটা দিবাস্বপ্নের মতো। তবে অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের জোরে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছে সুজন। গুগল, ইউটিউব থেকে রোবটিক্স এর নানা তথ্য একত্র করে, মাত্র ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি কথা বলা রোবট তৈরি করে ফেলেন সুজন। বাংলা ও বঙ্গবন্ধুর সাথে মিল রেখে রোবটটির নাম দিয়েছে 'বঙ্গ'। সুজনের এই 'বঙ্গ' বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে চমকে দিচ্ছে মানুষদের।

'বঙ্গ' শুধু কথা বলা নয় ভূমিকা রাখবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানেও। যে-কোনো প্রশ্ন গুগল থেকে সার্চ করে উত্তর দেবে। আশপাশে আগুন লাগলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিস অফিসে এসএমএস পাঠিয়ে জানিয়ে দিতে পারবে, বাড়িতে গ্যাসলাইন বা সিলিন্ডার লিকেজ হলে অ্যালার্ম দিয়ে সতর্ক করতে পারবে। ভালো ফলন পেতে কৃষকদের নানা তথ্য দিতেও সক্ষম সে। এছাড়া রোবটটি শিশুদের প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা শেখাতে পারবে। কেউ আঘাত পেলে, কেটে গেলে, জখম হলে, পানিতে ডুবে অসুস্থ হলে, আগুনে পুড়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয় জানিয়ে দিতে পারবে রোবট 'বঙ্গ'। যেখানে মানুষের জীবনের ঝুঁকি

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রয়েছে, এমন জায়গায় এই রোবটকে কাজে লাগানো সম্ভব। যেমন দুর্গম জায়গা থেকে কোনো কিছু উদ্ধার করতে ব্যবহার করা যাবে রোবটটিকে। এছাড়া ভারী বস্তু উত্তোলন এবং শিল্প কারখানায় নানা কাজে ব্যবহারসহ আবহাওয়া ও ভূমিকম্পের পূর্বাভাসও জানাতে পারবে এই রোবট। তার কাছে রয়েছে হাজারও প্রশ্নের সঠিক উত্তর। কোথাও আটকে গেলে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গুগল-ক্ষ উইকিপিডিয়া ঘেটে অনায়াসে উত্তর দিতে পারে সে। কাজ ছাড়াও সুজনের রোবটটি বেশ বিনয়ীও। কেউ করমর্দন করতে চাইলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাত বাড়িয়ে দেয়।

সুজন পাল টেলিভিশনে সোফিয়াকে দেখে রোবট বানানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তবে পরিচিত এমন কেউ ছিল না, যে তার মাধ্যমে রোবটিকস বিষয়ে ধারণা নিতে পারে। ইন্টারনেট নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহারও ছিল তার কাছে অসাধ্য ব্যাপার। একটি কম্পিউটার কেনার শখ ছিল। কিন্তু পরিবারে তা ছিল বিলাসিতা। তাই কম্পিউটার কেনার চিন্তা বাদ দিয়ে বাবা-মায়ের কাছে স্মার্টফোন কিনে দেওয়ার বায়না ধরে। অবশেষে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বাবা একটি স্মার্টফোন কিনে দেন। যা স্বপ্নপূরণের অনেক কাছাকাছি নিয়ে যায় সুজনকে।

করোনার মধ্যে কলেজ বন্ধ। তাই সারাদিন ইন্টারনেট ঘেঁটে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সম্পর্কিত নানারকম লেখা পড়তে শুরু করে, রোবোটিকস বিষয়ে নানা ভিডিও দেখে সুজন। তবে রোবট নিয়ে কাজ করা তত সহজ ছিল না। উপজেলা ও বিভাগীয় শহরে কিছু কিছু যন্ত্রাংশ পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ সেখানেও নেই। এরপর অনলাইনে যন্ত্রাংশ খোঁজা শুরু হয় । এই অর্থ জোগাড়ে শুরু সুজন করে টিউশনি। কিছু টাকা বাবা-মার কাছ থেকেও নেয়। এরপর শুরু হয় রোবট তৈরির হাতে-কলমে কাজ। ঝালাই করা (শোল্ডারিং) শিখেছে স্থানীয় দোকানের মেকানিকের কাছ থেকে। প্রথম দিকে বাসার কেউ জানত না। রোবট বানানোর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখত। যখন বাবা বাইরে যেত আর মা রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকত অথবা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কাজ করত সুজন। একদিন বাবা-মা টের পেয়ে গেলে বকা দিলেন। তবে থেমে যায়নি সুজন। দীর্ঘ চার মাসের চেষ্টায় বাড়িতে বসেই বানিয়ে ফেলে রোবট বঙ্গকে। যেদিন বানাতে সফল হয়েছিল, সেদিনই মা-বাবাকে দেখিয়েছে। রোবটটিকে কথা বলতে দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিলেন।

'বঙ্গ'র মূল কাঠামো তৈরি করা হয়েছে পিভিসি বোর্ড ব্যবহার করে। চার ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার রোবটটির দুটি অংশ। কোমর থেকে পা পর্যন্ত অংশটুকু বাদে উপরের অংশটুকু মূল কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রায় ২০ কেজি ওজনের রোবটটিতে ব্যবহার করা হয়েছে আরডুইনো বোর্ড। পাঁচ ধরনের সেন্সর ছাড়াও হাত ও ঠোঁট নাড়াচাড়া করতে এতে ব্যবহার করা হয়েছে ছোটো আকৃতির পাঁচটি মোটর।

প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণে দারিদ্র্যতাকে জয় করে মেধা দিয়ে বাংলা ও ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা এ রোবট তৈরির পেছনে ছিল সুজনের পরিবার, শিক্ষক ও সহপাঠীদের একনিষ্ঠ উৎসাহ, মনোবল আর ভালোবাসা। আর এ সবকিছুকেই অনুপ্রেরণার অংশ হিসেবে কাজে লাগিয়েছে ।

সুজন পাল (১৭) বরিশালের অগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের শিহিপাশা গ্রামের জয়দেব চন্দ্র পাল ও সবিতা রানী পাল দম্পতির সন্তান। ২০২০ সালে অগৈলঝাড়া সরকারি গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করে ভর্তি হয় সরকারি গৌরনদী কলেজের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে। সুজন পালের বাবা পেশায় কুমোর। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সুজন সবার ছোটো।

সুজনের এখন স্বপ্ন রোবটিকস বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়া। সে মনে করে, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেলে ছোটো এই রোবট থেকে হয়ত একদিন আরও বড়ো কিছু তৈরি করতে পারবে। কিশোর বয়সে কারও সাহায্য ছাড়াই এত বড়ো অর্জন বিশাল ব্যাপার। পরিশ্রম করলে তার মূল্য যে কেউ পেতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত সুজন। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মানহার 'ক্যাঙারু মাদার কেয়ার'

সুমাইয়া মৌশাখি

নবারুণের বন্ধুরা, তোমাদের আজ একটা অসাধারণ মেয়ের গল্প বলব, যে গল্প শুনে বিস্ময়ে তোমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। যে মেয়েটি ১১ বছর বয়সেই করে ফেলেছে এক অসাধারণ কাজ-যে কাজটি এ বয়সে কেউ নাকি কখনো করেনি! এ গল্প শোনার আগে শোনো 'ক্যাঙারু মাদার কেয়ার' মানেটা কী?

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় নবজাতক যদি কোনো কারণে কম ওজনের হয় বা অসুস্থ থাকে, তাহলে মায়ের বুকে শিশুকে এমনভাবে শুইয়ে রাখতে হয়, যাতে দুজনের ত্বকে ত্বক লেগে থাকে। এটাই 'ক্যাঙারু মাদার কেয়ার' (কেএমসি)। অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙারু যেমন নিজের পেটের নিচে একটি বিশেষ থলেতে বাচ্চা নিয়ে ঘুরে, সেই আদলেই কেএমসি সেবার ধারণাটা এসেছে।

এবার শোনো সেই অসাধারণ গল্প-

ছোট্ট মেয়ে মানহা। বয়স ১১। পড়ছে রাজধানীর দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই খুদে মেয়েটি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বড়ো একটি দায়িত্ব পালন করেছে। যে দায়িত্বটি পালন করার কথা ছিল তার মা, খালা, বাবা অথবা বড়ো কারোর। সময় পূর্ণ হওয়ার আগেই কম ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়া যমজ দুই ভাইয়ের মধ্যে এক ভাইকে হাসপাতালে এক মাস সাতদিন 'ক্যাঙারু মাদার কেয়ার' সেবাটা দিয়েছে মানহা নিজে।

মানহা তার মায়ের কষ্ট দেখে নিজ থেকেই ডাক্তারের কাছে জানতে চায় সে এ সেবাটা দিতে পারবে কিনা। তার উৎসাহ দেখে ডাক্তার তাকে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন। ডাক্তারের কথামতো খুব ভালোভাবে সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। এমনকি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও ভাইয়ের টেককেয়ার করছে।

উল্লেখ্য, মানহার যমজ দুই ভাই সম্প্রতি রাজধানীর বেসরকারি একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়। জন্মের সময় তাদের ওজন ছিল মাত্র ৮৫০ গ্রাম ও ৯৫০ গ্রাম। এই হাসপাতালের চিকিৎসক মো. মুজিবুর রহমান জানান, গুগলে সার্চসহ বিভিন্নভাবে যে তথ্য পেয়েছি, তাতে এত কম বয়সে আর কেউ কেএমসি সেবা দিয়েছে, তার নজির কোনো দেশে আছে বলে জানতে পারিনি। ■

লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বাংলাদেশি কন্যার বিরল সম্মাননা

জান্নাতে রোজী

ব্রিটিশ বাংলাদেশি তরুণী পাখি প্রেমী মিয়া রোজকে সম্প্রতি বিজ্ঞান সম্মাননা সূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করেছে ব্রিটেনের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি এ বিরল সম্মান অর্জন করেন। প্রাণ-প্রকৃতি, পাখপাখালির প্রতি দারুণ আগ্রহের কারণেই ২০ বছর বয়স পেরুনোর আগেই তিনি দেখেছেন পৃথিবীর নানা প্রজাতির পাঁচ হাজারের বেশি পাখি।

প্রকৃতিপ্রেমী এই তরুণী সংগঠক ও লেখক মিয়া রোজের পাখির প্রতি আকর্ষণ শুরু হয় ১১ বছর বয়স থেকেই। মা-বাবা ও বড়ো বোনের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জায়গায় পাখি দেখতে যেতেন। সেই সময়েই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বার্ডগার্ল ইউকে' নামে নিজের একটি ব্লগ। অনলাইনে পাখি বিষয়ক কিছু খোঁজ করতে গিয়ে তার নজরে আসে আমেরিকান বার্ডিং অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম। সেখানে তারা তরুণদের পাখি দেখার জন্য গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল। এই কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পরই তার মাথায় আসে যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কিংবা নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পাখি প্রেমীদের জন্য কিছু করার চিন্তা। সেই লক্ষ্যেই রোজ গঠন করে 'ব্লাক টু নেচার' নামের একটি সংগঠন। অলাভজনক এ সংগঠনটি বাংলাদেশিসহ যুক্তরাজ্যের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর তরুণদের পাখি দেখার ক্যাম্পসহ নানা আয়োজন করছে। 'ব্লাক টু নেচার' এখন পর্যন্ত নয়টি ইভেন্টের আয়োজন করেছে। এসব আয়োজনে ৩০০জন ভিএমই (ভিজিবল মাইনোরিটি এথনিক) শিশু-কিশোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

এছাড়াও মিয়া রোজ ৮ বছর বয়স থেকেই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ নিতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছেন। তাছাড়া বিশ্বের বিপন্ন প্রজাতি রক্ষায়ও জোরালো ভূমিকা রেখেছেন তিনি। সেজন্য পেয়েছেন বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড। এ বছর এ লেভেল সমাপ্ত করা এ তরুণী বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের দূত হিসেবে কাজ করছেন। তার মা-বাবা বাংলাদেশের সিলেট থেকে ব্রিটেনে গিয়ে স্থায়ী হয়েছেন।■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

আনজাম রশীদ খান

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ছিল ২রা এপ্রিল। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারিকালীন অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে ও নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'মহামারি উত্তর বিশ্বের ঝুঁকি প্রশমন, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ হবে প্রশমন'। করোনা মহামারির বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নীল বাতি জ্বালানো হয়। এছাড়া অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে রোড ব্যান্ডিং করা হয়। বিশেষ স্বরণিকা এবং লিফলেটও ছাপানো হয়। বিশ্ব অটিজম সচেনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, বিশ্ব অটিজম সচেনতা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'মহামারি উত্তর বিশ্বের ঝুঁকি প্রশমন, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ হবে প্রশমন'। এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, ১৪তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার ও পরিচর্যাকারীদের শুভেচ্ছা জানাই।

অটিজম আক্রান্ত শিশু ও বয়স্কদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ২রা এপ্রিলকে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালিত হচ্ছে।

একটা সময় ছিল যখন অটিজম ছিল একটি অবহেলিত জনস্বাস্থ্য ইস্যু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা ও স্কুল সাইকোলজিস্ট সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নিরলস প্রচেষ্টায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ২০০৭ সালে এ বিষয়ে দেশে কাজ শুরু করেন। সায়মা ওয়াজেদ এ অবহেলিত জনস্বাস্থ্য ইস্যুতে তাঁর বিরাট অবদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতিও পান। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস ও আমাদের নিদর্শন

মেজবাউল হক

বন্ধুরা, প্রতিবছর ১৮ই এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস। ১৯৮২ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস' তিউনিশিয়ায় একটি আলোচনা সভায় এই দিনটিকে 'ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে 'বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস' হিসেবে ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রদান করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের তাগিদ থেকে মূলত দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস ২০২১ সালের থিম হলো Complex Pasts Diverse Futures.

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি বিশ্বের দেশগুলোকে পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেছে। এগুলো হচ্ছে ১. আফ্রিকা ও আরব অঞ্চল (মধ্যপ্রাচ্যসহ) ২. এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (অস্ট্রেলিয়া ও ওশেনিয়া এ অঞ্চলভুক্ত) ৩. ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ৪. ল্যাটিন আমেরিকা ও ৫. ক্যারিবিয় অঞ্চল।

ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক গুরুত্বের জন্য বাংলাদেশের তিনটি নিদর্শনকে বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হিসেবে ঘোষণা করেছে ওয়ান হেরিটেজ কমিটি। এদের মধ্যে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার (১৯৮৫) ও বাগেরহাট মসজিদ শহর (১৯৮৫) বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভুক্ত প্রত্নস্থল। অন্যদিকে প্রাকৃতিক স্থান হিসেবে সুন্দরবন (১৯৯৭) বিশ্বে প্রাকৃতিক ঐতিহ্যস্থলভুক্ত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জায়গা পেয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং শীতলপাটি। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকেও ইউনেস্কো আওতাভুক্ত করেছে ২০১৭ সালে 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের জানাচ্ছি বিশ্ব ঐতিহ্যে স্থান পাওয়া নিদর্শনের কথা–

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার সম্রাট ধর্মপাল নির্মাণ করেছিল আজ থেকে প্রায় এক হাজার দুইশ বছর

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আগে। এটি পাহাড়পুর নামে পরিচিতি পেলেও প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার। ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের বিখ্যাত ধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল এটি। শুধু উপমহাদেশই নয়, চীন, তিব্বত, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মচর্চা ও ধর্মজ্ঞান অর্জনে আসতেন। স্থানীয় লোকজনের কাছে ৮০ ফুট উঁচু ঢিবি পাহাড়ের ন্যায় মনে হতো, তাই পরবর্তীতে তাদের কাছে এটির আধুনিক নাম হয় পাহাড়পুর। এটির অবস্থান নওগাঁর জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে। বৌদ্ধ বিহারটি চতুষ্কোণাকার। উত্তর ও দক্ষিণ বাহুদ্বয় প্রতিটি ২৭৩.৭ মিটার এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাহুদ্বয় ২৭৪.১৫ মিটার। এটির চারদিক চওড়া সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সীমানা প্রাচীর বরাবর অভ্যন্তর ছিল সারিবদ্ধ ছোটো ছোটো কক্ষ। উত্তর দিকের বাহুতে ৪৫টি এবং অন্য তিন দিকের বাহুতে রয়েছে ৪৪টি করে কক্ষ। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়।

বাগেরহাট মসজিদ শহর

বাংলার সুলতান শাসক নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বকালে (১৪৩৫-৫৯ সাল) খুলনা অঞ্চলে আসেন খানজাহান আলী। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণবঙ্গের একটি অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। খানজাহান আলী ছিলেন একজন প্রখ্যাত নির্মাতা। তিনি যশোর ও খুলনা জেলায় কয়েকটি শহর প্রতিষ্ঠা, মসজিদ, মাদরাসা, সরাইখানা, মহাসড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং বহুসংখ্যক দিঘি খনন করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, খানজাহান ৩৬০টি মসজিদ ও বহু বড়ো দিঘিও খনন করেছিলেন। 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' খানজাহানের সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি। মসজিদটিকে 'ষাট গম্বুজ' বলা হলেও এতে সর্বমোট গম্বুজ আছে ৮১টি। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাটকে স্থাপত্য কর্মের অসাধারণ নিদর্শনের জন্য বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সুন্দরবন

বিশ্বের অন্যতম বড়ো ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি, যা প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর অন্যান্য ম্যানগ্রোভ বনের সঙ্গে সুন্দরবনের রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। কেননা সুন্দরবনের বুক চিরে শুধু নোনা পানি নয়, ক্ষেত্রবিশেষে প্রবাহিত হয় স্বাদু পানির ধারা। পৃথিবীখ্যাত বিরল রয়েল বেঙ্গল টাইগার এই বনের প্রধান আকর্ষণ। ইতিহাস মতে, প্রায় দুই হাজার বছর আগে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় সুন্দরবনের সৃষ্টি হয়। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের কাছ থেকে ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি সুন্দরবনের স্বত্ব লাভ করে এবং ১৭৬৪ সালে সার্ভেয়ার জেনারেল কর্তৃক জরিপপূর্বক মানচিত্র তৈরি করে। বেঙ্গল বন বিভাগ স্থাপনের পর বন আইন ১৮৬৫ অনুযায়ী ১৮৭৫-১৮৭৬ সালে সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় সুন্দরবনের ছয় হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশ অংশে পড়েছে, যা বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমির ৪৪ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে সুন্দরবনে তিনটি অভয়ারণ্য এবং ২০১২ সালে তিনটি ডলফিন অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনের এক লাখ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য এলাকাকে ৭৯৮তম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে ইউনেস্কো। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

চির ভাস্বর বঙ্গবন্ধু

সাদিয়া ইফফাত আখি

গান্ধী শান্তি পুরস্কার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভারত সরকার 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' প্রদান করেছে। ২৬শে মার্চ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান হয় । অনুষ্ঠানে বড়ো বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ছোটো বোন শেখ রেহানা নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'এটা ভারতের জন্যও গর্বের আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার দিতে পেরেছি। মহাত্মা গান্ধী যে অহিংসার পথ দেখিয়ে গেছেন, একই ধরনের পথে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরে অসামান্য অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে ভারত সরকার।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ১২৩ ফুট উঁচুতে

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম একটি সুখবর। তা হলো, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ১২৩ ফুট উচ্চতায় বসানো হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য। কালীগঞ্জ উপজেলার শমসের নগরে এই টাওয়ারটি স্থাপন করেছেন ডা. রাশেদ শমসের ও তার পরিবার। শমসের নগরের 'সরকারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ' -এ ভাস্কর্যটি স্থাপিত হয়েছে। ভাস্কর্যটির নাম 'দ্য স্ট্যাচু অব স্পিচ অ্যান্ড ফ্রিডম'। এর ডিজাইন করেছেন বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার কীর্তিবাস রায় ও আজাদ রানা। ১২৩ ফুট উঁচু টাওয়ারটির ব্যাখ্যা হচ্ছে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০০ ফুট এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ২৩ বছরকে ২৩ ফুট ধরা হয়েছে। মোট ১২৩ ফুট উঁচুতে ভাস্কর্যটি বসানো হয়েছে। এই টাওয়ারটি মূলত ৮তলা বিশিষ্ট ১২৩ ফুট উঁচু। ১৭ই মার্চ এ ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়। শমসের বলেন, এত বেশি উচ্চতায় কোনো রাষ্ট্রনায়কের ভাস্কর্য স্থাপন বিশ্বে এটিই প্রথম।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মুজিববর্ষের মানব লোগো

বন্ধুরা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বরিশালে বঙ্গবন্ধুর সর্ববৃহৎ মানব লোগো প্রদর্শিত হয়েছে। ৩০শে মার্চ নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে মানব লোগো প্রদর্শিত হয়। বরিশাল সিটি করপোরেশনের এ আয়োজন দেখতে হাজার হাজার মানুষ বঙ্গবন্ধু উদ্যানে জড়ো হয়। আয়োজকদের দাবি, এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মানব লোগো। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানাতে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

এ মানব লোগোটি ১ হাজার ৩৫০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১ হাজার ৮০০ ফুট প্রস্থ। মানব লোগোতে বঙ্গবন্ধুর চশমার ফ্রেম করা হয়েছে ২ হাজার ৪০০ স্কয়ার ফুট জুড়ে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর বাম গালের তিলক করা হয়েছে ৪৮ স্কয়ার ফুট এবং মুজিবকোট করা হয়েছে ১ হাজার ৯শত ২০ স্কয়ার ফুট জায়গা জুড়ে। এ আয়োজনে খুশি সাধারণ মানুষ। পৃথিবীতে এমন আয়োজন বিরল বলে দাবি আয়োজকদের।

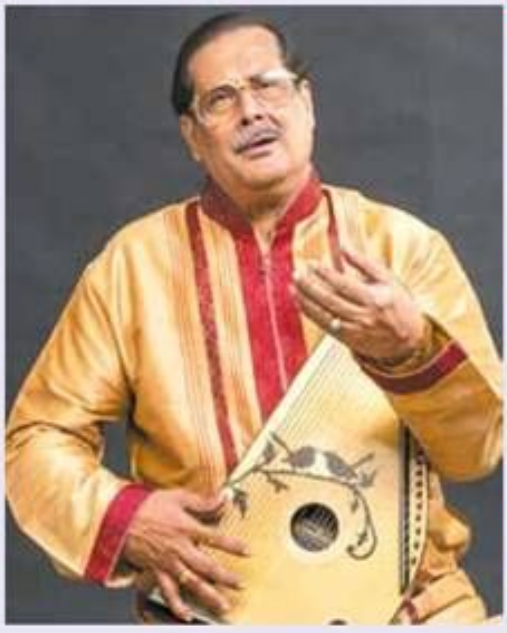

বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ রাগ 'মৈত্রী'

বন্ধুরা, প্রথমেই তোমাদের বলে নেই 'রাগ' মানে কী। এখানে রাগ বলতে বোঝানো হয়েছে, আমরা যাকে গানের সুর বলি সেটিকেই। সুরকে ভালো কথায় বলা হয় রাগ বা রাগিণী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে বিশ্ববরেণ্য ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী 'মৈত্রী' নামে একটি রাগ সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের জাতির পিতাকে উৎসর্গ করা এই রাগের উপজীব্য ভারত-বাংলাদেশ মিত্রতা। ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে 'মৈত্রী' বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা হয়েছে বলে জানান পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। এই রাগটি একেবারে নতুন এবং সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী। এটি শাস্ত্রীয় সংগীতের নিয়মে রচিত। রাগে সংস্কৃত, হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় রচিত তিনটি গান পরিবেশিত হবে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফারাহনাজ সিদ্দিকী রিমিন, ৮ম শ্রেণি, স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শারিকা তাসনিম নিধি, দ্বিতীয় শ্রেণি, চিলড্রেন একাডেমি, চাঁদপুর

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তাসদীদ তাবাসসুম আসফিয়া, ২য় শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ইরাম ইনায়া, কেজি শ্রেণি, টাঙ্গাইল প্রি-ক্যাডেট স্কুল, টাঙ্গাইল

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

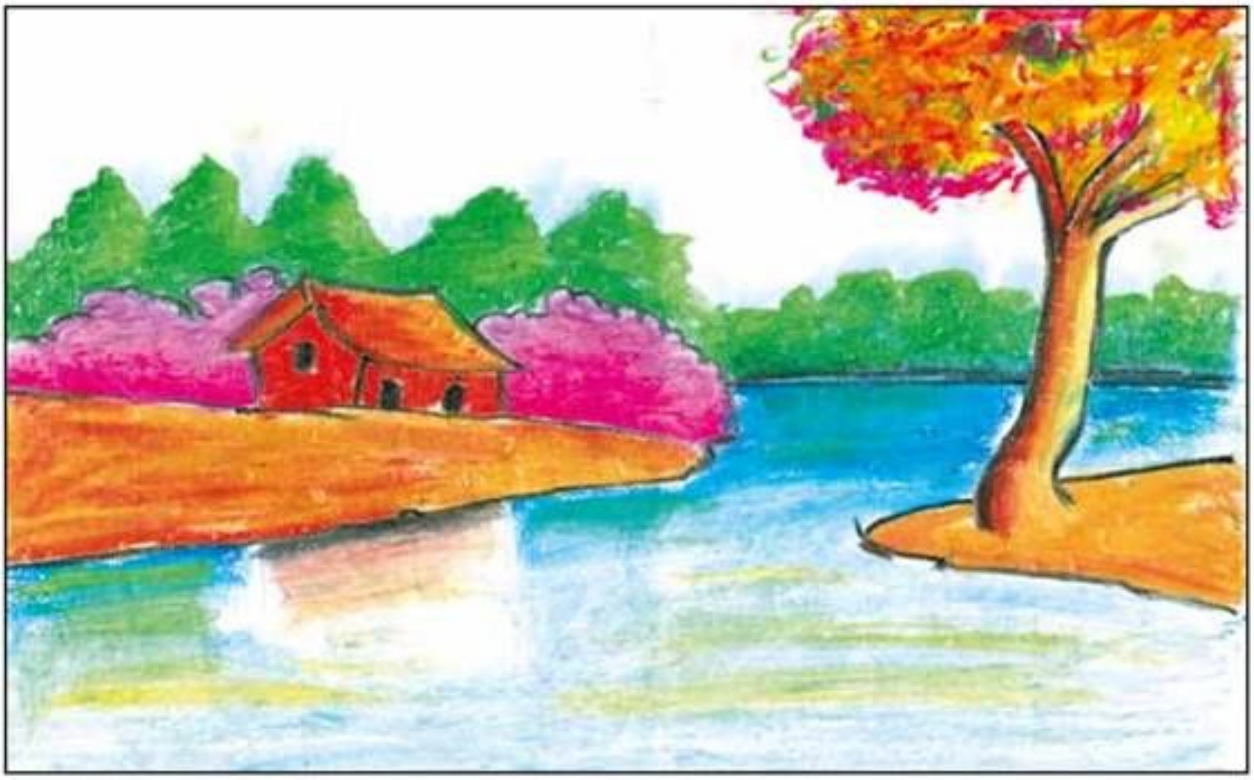

মীর্জা মাহের আসেফ, ৫ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সানজিদা আক্তার রুপা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-10, April 2021, Tk-20.00

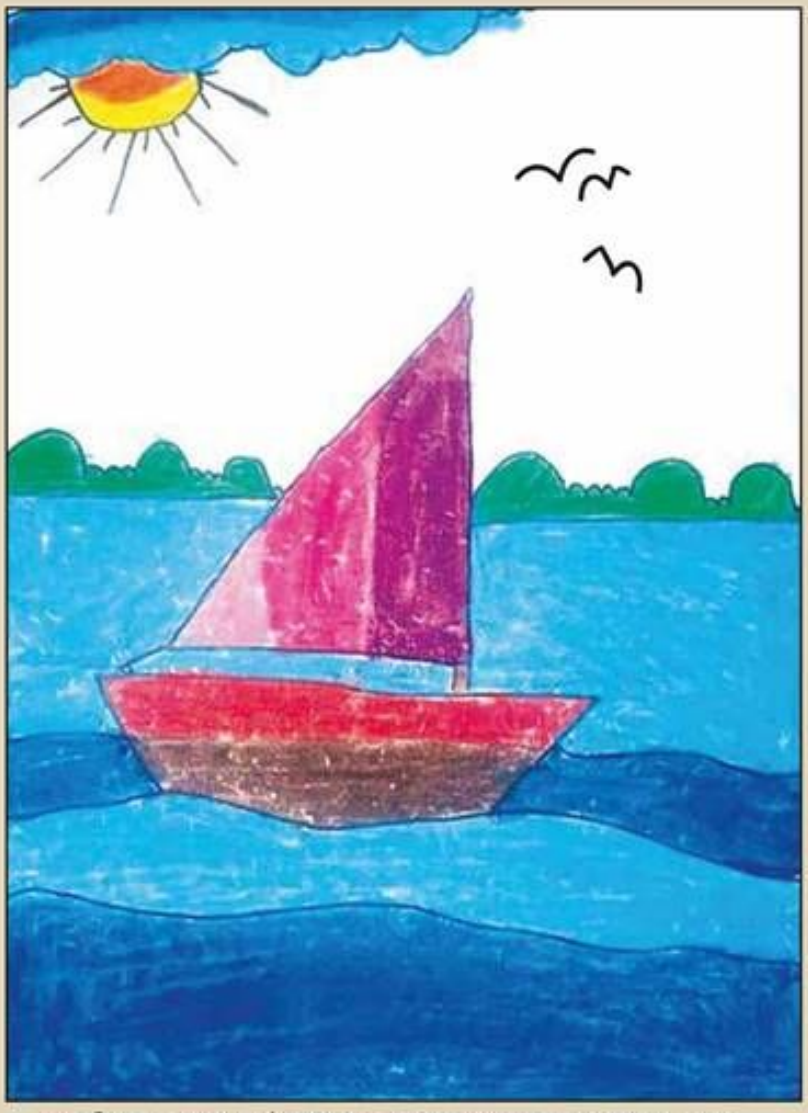

শ্রাবন্তী ঘোষ অর্ঘে, ৪র্থ শ্রেণি, পরশমনি ল্যাবরেটরি স্কুল, উত্তরা, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা